

হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

অষ্টম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

অষ্টম শ্রেণি

রচনা

প্রফেসর ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল
প্রফেসর ড. দুলাল কান্তি ভৌমিক
বিষ্ণু দাশ
ড. ধীরেন্দ্রনাথ তরফদার
ড. শিশির মল্লিক
শিখা দাস

সম্পাদনা

প্রফেসর নিরঞ্জন অধিকারী

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

পরীক্ষামূলক সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১২

পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সমন্বয়ক

প্রীতিশঙ্কর সরকার

গৌরাঙ্গ লাল সরকার

কম্পিউটার কম্পোজ

পারফর্ম কালার গ্রাফিক্স (প্রা:) লি:

প্রচ্ছদ

সুদর্শন বাহার

সুজাউল আবেদীন

চিত্রাঙ্কন

উজ্জ্বল ঘোষ

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বোত্তম মুখী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত জনশক্তি। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়া প্রাথমিক স্তরে অর্জিত শিক্ষার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলাও এ স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য। জ্ঞানার্জনের এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত এই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে, সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক। উক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, প্রবণতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে শিখনফল যুক্ত করে শিক্ষার্থীর অর্জিতব্য জ্ঞানের ইজ্জাত প্রদান করা হয়েছে এবং বিচিত্র কাজ, সৃজনশীল প্রশ্ন ও অন্যান্য প্রশ্ন সংযোজন করে মূল্যায়নকে সৃজনশীল করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর আলোকে মাধ্যমিক স্তরের ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির হিন্দুধর্ম শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকটির নামকরণ করা হয়েছে **হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা**। এ পাঠ্যপুস্তক বের প্রতিটি অধ্যায়ে ধর্মের তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ সরলভাবে উপস্থাপনের পাশাপাশি ধর্মীয় ধারণার জীবনাচরণমুখী শিক্ষা এবং এর প্রায়োগিক দিক আলোচিত হয়েছে। ফলে এ পাঠ্যপুস্তকটি অধ্যয়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা উপলব্ধি করতে পারবে, ধর্মের তাত্ত্বিক জ্ঞান শুধুমাত্র ধর্মালোপ এবং অনুষ্ঠান আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এটি নৈতিক চরিত্র গঠন এবং সমাজের একজন নৈতিক ও মানবিক গুণসম্পন্ন ভালোমানুষ গড়ে তোলার পথ নির্দেশকও।

একবিংশ শতকের অজ্ঞীকার ও প্রত্যয়ে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে। কাজেই পাঠ্যপুস্তকটির আরও সমৃদ্ধিসাধনের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের বিপুল কর্মযজ্ঞের মধ্যে অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে পুস্তকটি রচিত হয়েছে। ফলে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণগুলোতে পাঠ্যপুস্তকটিকে আরও সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের আনন্দিত পাঠ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র

| অধ্যায় | অধ্যায়ের শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|----------|--------------------------------|--------|
| প্রথম | ঈশ্বরের স্বরূপ | ১-৯ |
| দ্বিতীয় | ধর্মগ্রন্থ | ১০-২২ |
| তৃতীয় | হিন্দুধর্মের স্ব রূপ ও বিশ্বাস | ২৩-৩৪ |
| চতুর্থ | নিত্যকর্ম ও যোগাসন | ৩৫-৪৪ |
| পঞ্চম | দেব-দেবী ও পূজা পার্বণ | ৪৫-৫৫ |
| ষষ্ঠ | ধর্মীয় উপাখ্যানে নৈতিক শিক্ষা | ৫৬-৬৬ |
| সপ্তম | আদর্শ জীবনচরিত | ৬৭-৮৭ |
| অষ্টম | হিন্দুধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধ | ৮৮-১০০ |

প্রথম অধ্যায়

ঈশ্বরের স্বরূপ

কত বিচিত্র আমাদের প্রকৃতি ও পরিবেশ! উপরে অনন্ত আকাশ, নিচে জীবকুল, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত। আমাদের পৃথিবী অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ এবং প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে ভরপুর। যেমন — ঋতুচক্রের আবর্তন, দিন-রাত্রির পালাবদল, গ্রহাণুপুঞ্জের আপন কক্ষপথে নিয়মতান্ত্রিকভাবে আবর্তিত হওয়া প্রভৃতি। অনন্ত আকাশে চন্দ্র, সূর্যসহ অসংখ্য গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্র রয়েছে। এসকল গ্রহ, নক্ষত্র ও উপগ্রহসমূহ নির্দিষ্ট গতিপথে ঘুরছে। সংঘাতের সৃষ্টি হচ্ছে না। সবকিছুই একটি গভীর ঐক্য ও শৃঙ্খলার মাধ্যমে চলছে। এ সবকিছুর কারণ ঈশ্বর এবং সবকিছুর তিনিই নিয়ন্ত্রক। অন্যথায় এ-মহাবিশ্বের সবকিছু যথানিয়মে আবর্তিত হতো না।

ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। তিনি নিরাকার, শাস্ত বা নিত্য, অবিনশ্বর।

এ-বিশ্বে যা কিছু ঘটে তার একটি কারণ আছে। এ-কারণেরও কারণ আছে। এ-মহাবিশ্ব সৃষ্টির কারণ অনুসন্ধান করলে অনেক কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে। সৃষ্টির প্রথম কারণকে যদি প্রধান সূচনাকারী হিসেবে আখ্যা দেওয়া যায়, তবে দেখা যাবে তিনিই ঈশ্বর, তিনিই সৃষ্টির প্রথম কারণ।



ঈশ্বর যখন নিরাকার, তখন তিনি ব্রহ্ম। আবার তিনিই ভগবান এবং জীবের মধ্যে আত্মরূপে তিনিই অবস্থান করেন। জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি ও ব্যাখ্যা করেন। চিরশান্তি বা মোক্ষলাভের জন্য ভক্ত ঈশ্বরের কাছে স্তুতি করেন এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা জানান। হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহে অনেক মন্ত্র ও শ্লোক রয়েছে। এ-অধ্যায়ে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

এ-অধ্যায়-শেষে আমরা —

- □ ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় — এ-ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারব
- □ ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান ও জীবাত্মা — এ-ধারণাসমূহের ব্যাখ্যা করতে পারব
- □ জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তের দৃষ্টিতে ঈশ্বরের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারব
- □ ঈশ্বরের আত্মরূপে অবস্থান ও স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারব

- ধর্মগ্ৰন্থ থেকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে একটি প্রার্থনামূলক সংস্কৃত শ্লোক ও একটি বাংলা কবিতা অর্থসহ ব্যাখ্যা করতে পারব
- ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধির মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস স্থাপন করতে পারব।

পাঠ ১ : ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়

ঈশ্বর এ-বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। তিনিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-র সকলকিছুর নিয়ন্ত্রক।

দেব-দেবীরা তাঁরই গুণ বা শক্তির প্রতিভূ। তিনি এক ও অদ্বিতীয়।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ঈশ্বরের একত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে—

একো দেবঃ সর্বভূতেষু গৃঢ়ঃ

সর্বব্যাপী সর্বভূতাত্তরাত্মা।

কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাবিবাসঃ

স্বাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥



সব্বলার্থ : দেবাদিদেব ঈশ্বর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং জীবের মধ্যে প্রচ্ছন্নরূপে অবস্থান করছেন। তিনিই সর্বব্যাপী। সকল জীবের আত্মা, সকল কাজের কর্তা এবং সকল জীবের আবাসস্থল। তিনি সকল কিছু দেখেন, সকল জীবকে চেতনা দান করেন। তিনি নিরাকার ব্রহ্ম।

ঈশ্বর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে এক শৃঙ্খলার মাধ্যমে পরিচালিত করছেন। গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্রসমূহ এ-মহাকাশে নির্দিষ্ট গতিপথে আবর্তিত হচ্ছে। জীব ও জড়বস্তু সবকিছুই একটি শৃঙ্খলার মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে। জীব জন্মলাভ করছে, আয়ুশেষে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে দেহত্যাগ করছে। হিন্দুধর্মামুসারে দেহের ধ্বংস আছে, কিন্তু জীবাত্মার ধ্বংস নেই।

পৃথিবীর বিভিন্ন জীবের বৈচিত্র্যের মাঝে একটি শৃঙ্খলা বিরাজ করছে। একজন কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক না থাকলে এ-মহাবিশ্বের সকল কিছু শৃঙ্খলার মধ্যে পরিচালিত হতো না।

ধ্যানধারণা ও মানুষের অভিজ্ঞতা হতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়। পূর্ণতালাভের অর্থই জ্ঞানার্জন, শক্তির সঞ্চয়। ধার্মিকতা ও সততা ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস আনয়ন করে, যার মাধ্যমে নৈতিক চিন্তাবোধ বিকশিত হয়। উপনিষদে উল্লেখ আছে যে, ‘সূর্য তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না, চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ, অগ্নিও তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না, সর্বত্র তিনিই প্রকাশিত আছেন এবং সকল কিছুই তিনি প্রকাশ করেন।’ উপনিষদে আরও বলা হয়েছে, প্রাণী ও অপ্রাণী যে-কোনো বিষয়ে বা পদার্থ যে-স্থান থেকে জন্মলাভ করে, মৃত্যু বা ধ্বংসের মাধ্যমে আবার যার কাছে ফিরে আসে, তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে ভালো কাজের ফল শুভ এবং মন্দ কাজের ফল অশুভ। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ। তিনি সবকিছু জানেন। তাই তিনি পুণ্যাত্মকে সুখী করেন, অপরাধীদেরকে শাস্তি দেন এবং অদৃশ্যভাবে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি সবকিছুর একমাত্র নিয়ন্ত্রক।

একক কাজ : ঈশ্বরের একত্ব সম্পর্কে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের স্তোত্রটি আবৃত্তি কর।

নতুন শব্দ : শাশ্বত, অবিদ্যমান, বিশুব্রহ্মাণ্ড।

পাঠ ২ ব্রহ্মা, ঈশ্বর, ভগবান ও জীবাত্মা

ঈশ্বরের বিভিন্ন নাম রয়েছে এবং আমরা তাঁকে বিভিন্ন নামে ডাকি। যেমন— ব্রহ্ম (পরমাত্মা), ঈশ্বর ও ভগবান। ঋষিরা ঈশ্বরকে ব্রহ্ম পরমাত্মা, ঈশ্বর, ভগবান ও আত্মা (জীবাত্মা) - রূপে উপলব্ধি করেছেন এবং তাঁর স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা ঋষিদের বর্ণনানুসারে ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান ও জীবাত্মার পরিচয় জানব।



ব্রহ্ম

হিন্দুধর্ম অনুসারে বিশুব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মেরই সৃষ্টি। ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান সকল জীব ও বস্তু র স্রষ্টা। এ বিশুব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু ঘটেছে সবই তাঁর কারণে। নিরাকার ব্রহ্মকে বোঝাবার জন্য ঋষিরা ‘ওঁ’—এ প্রতীকী শব্দ ব্যবহার করেছেন। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ হচ্ছে বৃহৎ। বৃহত্ত্ব ব্রহ্ম—বৃহৎ বলেই নাম তাঁর ব্রহ্ম এবং এ-ব্রহ্ম নিরাকার। আবার ব্রহ্মকে বলা হয়েছে, তিনি সত্য। অর্থাৎ সত্যই ব্রহ্ম। কোনো কোনো ঋষি আবার বলেছেন, ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। আমাদের আনন্দ ব্রহ্মেরই আনন্দ। এই ব্রহ্মকেই আবার বলা হয় পরমাত্মা।

ঈশ্বর

ঈশ্বর শব্দের অর্থ প্রভু। অর্থাৎ সকল জীবের সকল কাজের প্রভুত্বকারী। ব্রহ্ম যখন জীবের উপর প্রভুত্ব করেন এবং জীবকুলে সকল কাজ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন তখন তাঁকে ঈশ্বর বলা হয়। নিরাকার ঈশ্বর তাঁর নিজের ইচ্ছা অনুসারে, নিজের আনন্দের জন্য নিজেকেই নানারূপে রূপায়িত করেন।

ঈশ্বরই অবতার। তিনি যখন দুষ্কের দমন করেন এবং ন্যায়-নীতি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথিবীতে নেমে আসেন, তখন তাঁকে অবতার বলে। যেমন— মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, বামন, রাম প্রভৃতি।

আবার ঈশ্বরের কোনো গুণ বা শক্তি যখন আকার পায়, তখন তাঁকে দেবতা বা দেব-দেবী বলে। যেমন—শক্তির দেবী দুর্গা, বিদ্যার দেবী সরস্বতী ইত্যাদি।

একথা সত্য যে, ঈশ্বর বহু নয়। অবতার বা দেব-দেবী ঈশ্বরেরই বিভিন্ন রূপ। সবই এক ঈশ্বরের লীলা।

ভগবান

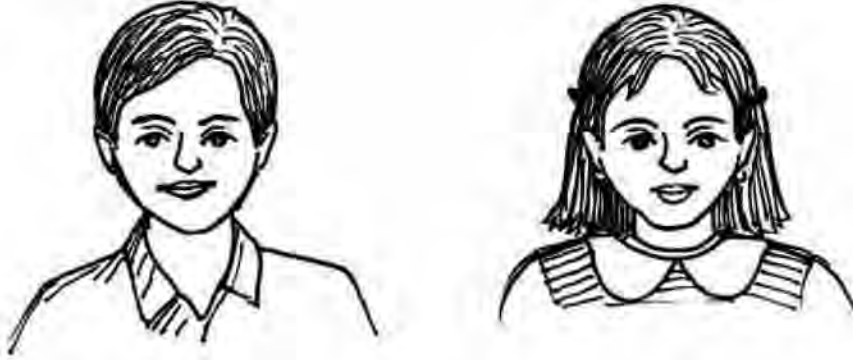
ঈশ্বরকে আমরা সর্বশক্তিমান হিসেবে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করি। সর্বশক্তিমান বা সবকিছুর নিয়ন্ত্রক বলে আমরা তাঁকে সমীহ করি এবং ভালোবাসি। তাঁকে ঘিরে আমাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ভালোবাসার জ্বল সৃষ্টি করি। ভালোবাসার অপর নাম মায়া বা মমতা; এই মায়ার জ্বলে সকল জীব আবদ্ধ। তবে আমাদের কোনোকিছুর অভাব ঘটলে বা গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হলে ঈশ্বর আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হন। আমরা তাঁকে দেখতে পাই না, উপলব্ধি করতে পারি এবং ভক্তি করি। ভক্তের নিকট ঈশ্বর ভগবানরূপে আবির্ভূত হয়ে থাকেন। ভক্তের কাছে ভগবান সাকার, আনন্দময় ও সর্বশক্তিমান।

‘ভগ’ শব্দটির মানে হচ্ছে ঐশ্বর্য। এখানে ‘ভগ’ বলতে ঈশ্বরের ছয়টি গুণের কথা বলা হয়েছে। এ-গুণগুলো হলো— ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য। এই ছয়টি ভগ বা ঐশ্বর্য আছে বলে ঈশ্বরকে ভগবান বলা হয়। ভগবান ভক্তের ভাকে সাড়া দেন ও লীলা করেন। সুতরাং, ঈশ্বর যখন ভক্তদের কৃপা করেন, তাদের দুঃখ দূর করে তাদের মজালা করেন তখন তাঁকে ভগবান বলা হয়।

আত্মা বা জীবাত্মা

ঈশ্বর বা ব্রহ্মের আরেক নাম পরমাত্মা। এ-পরমাত্মা জীবের মধ্যে অবস্থান করেন বলেই জীবের চেতনাশক্তি আছে। এই চেতনাই জীবাত্মা বা পরমাত্মা। এ-জীবাত্মা বা পরমাত্মার ধ্বংস নেই। কেবল দেহের ধ্বংস হয়। আর দেহের এ ধ্বংসকেই বলা হয় মৃত্যু।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবের মধ্যে আত্মারূপে নিরাকার ব্রহ্ম বা পরমাত্মার ক্রিয়াশীল থাকার বিষয়টি চমৎকারভাবে তাঁর একটি কবিতায় প্রকাশ করেছেন :



সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর,
আমার মাঝে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।

জীবের দেহের সীমার মধ্যে আত্মারূপে পরমাত্মা বিরাজ করেন। তাই জীবের মধ্যে ঈশ্বর ক্রিয়াশীল বলেই জীবন এত সুন্দর, এত মধুর।

সুতরাং ব্রহ্মই ঈশ্বর, ভগবান এবং জীবাত্মা। ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়।

দলীয় কাজ : ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে লিখে একটি তালিকা তৈরি কর।

নতুন শব্দ : কূর্ম, ভগ, বৈরাগ্য, সর্বজ্ঞ।

পাঠ ৩ : জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তের দৃষ্টিতে ঈশ্বর

জ্ঞানী, যোগী এবং ভক্ত ঈশ্বরকে নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে উপলব্ধি করেছেন এবং বর্ণনা করেছেন। জ্ঞানী জ্ঞানের দৃষ্টিতে, যোগী যোগসাধনার মধ্য দিয়ে এবং ভক্ত ভক্তির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন।

ঈশ্বরকে যিনি জ্ঞানের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করেছেন তিনিই জ্ঞানী। ধর্মপালন ও ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভের জন্য গীতায় বিভিন্ন পথের কথা বলা হয়েছে। ঈশ্বরলাভের এসকল পথকে যোগসাধনা বলা হয় এবং যাঁরা নিজেদের মধ্যে আত্মার উপাসনা করেন এবং যোগসাধনার সাথে সম্পৃক্ত হন তাঁদেরকে যোগীরূপে আখ্যায়িত করা হয়। আবার যাঁরা ভক্তির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করেন তাঁরা হলেন ভক্ত। এখন জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তের দৃষ্টিতে ঈশ্বরের যে - স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে, সংক্ষেপে তার আলোচনা করা হলো।

জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ঈশ্বর

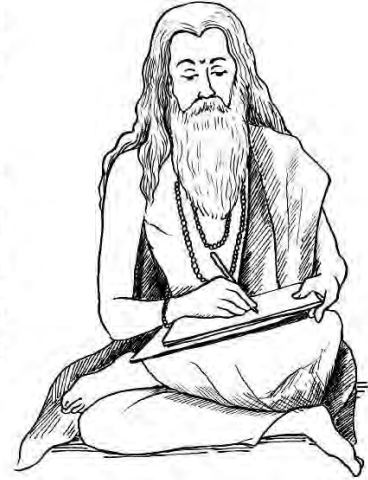
যাঁরা সকল বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করে কেবল সর্বব্যাপী ও নিরাকার ব্রহ্মকে উপাসনা করেন এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন তাঁদের জ্ঞানী বলা হয়। জ্ঞানীদের কাছে ঈশ্বর ব্রহ্ম যিনি এ-মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। জ্ঞানী ব্যক্তির মানুষ্যের জন্ম, জীবের জন্ম এবং ঈশ্বরের ভালোবাসা লাভের জন্য কাজ করেন। জ্ঞান অর্থ জানা, যোগ অর্থ যুক্ত হওয়া। জ্ঞানী শব্দের অর্থ দাঁড়ায় কোনো বিষয় সম্পর্কে জানার সাথে যুক্ত হওয়া।

জ্ঞান দুই প্রকার—বিদ্যা ও অবিদ্যা। বিদ্যা ও অবিদ্যা আবার পরা ও অপরা হিসেবেও পরিচিত। বিদ্যাতে ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা হয়, আত্মজ্ঞান বৃদ্ধি পায় যা থেকে সর্বভূতে ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি, জাগতিক বিষয়ে বৈরাগ্য উদয় এবং মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়। অবিদ্যায় জাগতিক বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানলাভ হয়, কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভ হয় না এবং ব্রহ্ম বিষয়ে কিছু জানা যায় না। তবে ধর্মশাস্ত্র অনুসারে জ্ঞানী বলতে আত্মা ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞানী ব্যক্তিদের বোঝানো হয়।

যোগীর দৃষ্টিতে ঈশ্বর

যাঁরা একাগ্রতা সহকারে মনের অন্তস্থল থেকে ঈশ্বরের অনুসন্ধান করেন, সকল কামনা-বাসনা দূর করে দিতে চেষ্টা করেন তাঁদেরকে যোগী বলা হয়। এঁদের কাছে ঈশ্বরকে লাভ করা মুখ্য কাজ।

যোগীদের দৃষ্টিতে ঈশ্বর পরমাত্মা। এই পরমাত্মাই জীবাত্মারূপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। তাই যোগীর কাছে জীবও ঈশ্বর। মহাযোগী ও জ্ঞানী স্বামী বিবেকানন্দ এ-মহাবিশ্বের সকল কিছুই বহুরূপে ঈশ্বরের প্রকাশ বলে অভিহিত করেছেন এবং তিনি ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর অমর বাণী প্রচার করেছেন— ‘জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।’ অর্থাৎ জীবের সেবা করলেই ঈশ্বরের সেবা করা হয়।



ভক্তের দৃষ্টিতে ঈশ্বর

যাঁরা সংসারের বিষয় ও বৈয়য়িক কর্মের মধ্য থেকে সর্বশক্তিমান ভগবানের উপাসনা করেন, তাঁদের ভক্ত বলা হয়। ভক্তেরা সর্বজীবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন এবং সেভাবেই জীবসেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সেবা করে থাকেন।

ভক্তের নিকট ঈশ্বর ভগবান। তিনি সাকার। তিনি রসময়, আনন্দময় ও গুণময়।



কখনও কখনও ভগবান ভক্তের সেবা করেন। ভক্তের বোঝা বহন করেন। ভক্তও ভগবানের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেন। নিজের সকল কাজকে ভগবানের কাজ বলে সম্পাদন করেন। ভগবানের প্রতি ভক্তের মনে নিবিড় ও গভীর ভালোবাসা বিরাজ করে। শুধু তা-ই নয়, তাঁর সৃষ্টিকেও যেন গভীরভাবে ভালোবাসতে পারে সেজন্য ভক্ত তাঁর নিকট বিভিন্ন সময় প্রার্থনা করেন।

নতুন শব্দ : সমর্পণ, আত্মজ্ঞান, বিষয়বাসনা, রসময়, মহাযোগী।

পাঠ ৪ : প্রার্থনামূলক মন্ত্র ও বাংলা কবিতা

ক. প্রার্থনামূলক মন্ত্র

দূতে দৃংহে মা মিত্রস্য চক্ষুসা
সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষন্তাম্
মিত্রস্যাং চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষে ।
মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষামহে ॥

(শুরু যজুর্বেদ, ৩৬।১৮)

সরলার্থ : হে ঈশ্বর, আমাদের এমন দূত কর যেন সকল প্রাণী আমাদের কক্ষুর চোখে দেখে। আমিও যেন তাদের কক্ষুর চোখে দেখি। আমরা সকলেই যেন পরস্পরকে কক্ষুর চোখে দেখি।

ব্যাখ্যা :

শুরু যজুর্বেদের এ-মন্ত্রে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে, ঈশ্বর যেন আমাদের জ্ঞানে, শক্তিতে এমন দূত করেন, যেন সকল প্রাণী আমাদের সঙ্গে কক্ষুর মতো আচরণ করে। আমরাও যেন সকলের সঙ্গে কক্ষুর মতো আচরণ করি।

কাউকে যেন হিংসা না করি। এভাবে আমরা সকলেই যেন সকলের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করি। তার ফলে জীবন হবে শান্তিময়। বন্ধুত্বের মধ্য দিয়ে শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হোক—এ-প্রার্থনা মন্ত্রটির মধ্য দিয়ে সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়েছে।

খ. প্রার্থনামূলক বাংলা কবিতা

অন্তর মম বিকশিত করো অন্তরতর হে—
নির্মল করো, উজ্জ্বল করো, সুন্দর করো হে ॥
জাগ্রত করো, উদ্যত করো, নির্ভয় করো হে।
মজ্জাল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে ॥
যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ।
সম্মগ্ন করো সকল কর্মে শান্ত তোমার হৃদ।
চরণপদে মম চিত্ত, নিম্নান্বিত করো হে।
নন্দিত করো, নন্দিত করো, নন্দিত করো হে।।

(গীতবিতান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ব্যাখ্যা : ঈশ্বরের কাছে পবিত্র, উদার ও সুন্দর মন এবং সচেতনতা, সক্রিয়তা ও নির্ভীকতা প্রার্থনা করা হয়েছে। ঈশ্বর যেন আমাদের ঐক্যবন্ধ করেন এবং ঈশ্বরের সৃষ্টিতে যেমন শৃঙ্খলা রয়েছে, আমাদের সকল কাজে যেন থাকে সেই শৃঙ্খলা। আমরা যেন নির্ভয় ও নিঃসংশয়ে সকল কাজ করতে পারি এবং সকলের তথা বিশ্বের সকল প্রাণীর মজ্জালসাধন করতে পারি। সকল বাধাবিঘ্ন ছিন্ন করে আমরা সকল মজ্জাল ও সুন্দর কাজের মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে মিলিত হতে পারি। সবশেষে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে, যেন ঈশ্বরের প্রতি আমাদের প্রগাঢ় ভক্তি থাকে। ঈশ্বর যেন আমাদের মজ্জাল করেন এবং আনন্দে রাখেন।

টীকা

যজুর্বেদ : হিন্দুধর্মের একটি মৌলিক গ্রন্থ। এতেও ঋগ্বেদের মতো দেবতাদের উদ্দেশে তু তি ও প্রার্থনামূলক মন্ত্র রয়েছে। যজুর্বেদের দুটি অংশ—শুক্ল ও কৃষ্ণ। যজুর্বেদের প্রধান বর্ণনার বিষয় যজ্ঞ ও যজ্ঞপ্রণালী।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ : বারোটি প্রধান উপনিষদের মধ্যে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ অন্যতম। এ-অনুশ্রুতি আমরা কোথা থেকে জন্মেছি, কীভাবে জীবনধারণ করছি এবং প্রলয়ের পরে কোথায় থাকব এসকল বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। এ-উপনিষদে ব্রহ্মের স্বরূপও ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

একক কাজ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রার্থনামূলক কবিতাটির প্রভাব সম্পর্কে লেখ।

নতুন শব্দ : নিঃসংশয়, নিম্নান্বিত, সম্মগ্ন, সক্রিয়তা, নির্ভীকতা।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. এ বিশ্বসৃষ্টির প্রথম কারণ ।
২. ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে ভালো কাজের ফলাফল ।
৩. ঈশ্বর শব্দের অর্থ ।
৪. ভক্তের নিকট ঈশ্বর ।
৫. জ্ঞানীর কাছে লাভ করা মুখ্য কাজ ।

মিলকরণ : ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর :

| বাম পাশ | ডান পাশ |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| ১. ঈশ্বর যখন নিরাকার | তিনি স্বয়ম্ভু |
| ২. ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ | ব্রহ্মেরই আনন্দ |
| ৩. ব্রহ্মের কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই | সর্বশক্তিমান সকল জীব ও বস্তু র সৃষ্টি |
| ৪. আমাদের আনন্দ | ব্রহ্মারই সৃষ্টি |
| | তখন তিনি ব্রহ্মা |

নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১. ঈশ্বরকে এক ও অদ্বিতীয় বলা হয়েছে কেন ?
২. আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি কেন ?
৩. পরমাত্মা বলতে কী বোঝায় ?
৪. ঈশ্বর কখন ব্রহ্ম হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন ?

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. ঈশ্বরকে ভগবান বলার কারণ ব্যাখ্যা কর ।
২. ঈশ্বরের আত্মারূপে অবস্থান ও স্বরূপ ব্যাখ্যা কর ।
৩. ভক্তের দৃষ্টিতে ঈশ্বরের ধারণা ব্যাখ্যা কর ।
৪. পাঠ্যে উল্লিখিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলা প্রার্থনাটি লেখ এবং এর অর্থ ব্যাখ্যা কর ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. যোগীর কাছে ঈশ্বর—
 ক. ব্রহ্ম
 গ. পরমাত্মা
 খ. ভগবান
 ঘ. পরমেশ্বর
২. সকল জীবের মধ্যে চৈতন্যবোধ জাগ্রত করেন কে ?
 ক. ঈশ্বর
 গ. ব্রহ্ম
 খ. ভগবান
 ঘ. পরমেশ্বর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

সজল তার বন্ধুদের কাছে বলেছে সে আর কোনো পাপকাজ করবে না। সে চায় পৃথিবীতে যেমন তার জন্ম হয়েছিল নিম্পাপভাবে ঠিক তেমনি বাকি জীবনটা পুণ্যার্জন করেই মৃত্যুবরণ করতে।

৩. সজলের মধ্যে কোন গ্রন্থের জ্ঞান কাজ করেছে ?
 ক. যজুর্বেদ
 গ. শ্বেতাশ্বতর
 খ. অথর্ববেদ
 ঘ. কঠোপনিষদ
৪. সজলের উক্ত কাজের মুখ্য উদ্দেশ্য —
 i. পারলৌকিক সুখ
 ii. ইহলৌকিক সুখ
 iii. জাগতিক সুখ

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন :

কবিতা ও সবিতা দুই বোন। কবিতা ঈশ্বরকে জানার জন্য প্রচুর পড়াশোনা করে। সংসারের কোনো কাজের প্রতি তার মনোযোগ নেই। তার চিন্তা শুধু ঈশ্বরকে নিয়ে। অন্যদিকে সবিতা পড়াশোনা করে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চায়। সে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়নের পাশাপাশি পূজা-পার্বণও করে, যাতে সবাইকে নিয়ে সুখে শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারে।

১. যজুর্বেদের কয়টি অংশ ?
২. স্বামী বিবেকানন্দের ঈশ্বর-সম্পর্কিত বাণীটি ব্যাখ্যা কর।
৩. সবিতা কোন বিদ্যা অধ্যয়ন করেছে? তোমার পঠিত 'জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ঈশ্বর'-এর আলোকে ব্যাখ্যা কর।
৪. শাস্ত্র অনুযায়ী সবিতাকে জ্ঞানী বলা যায় কি? তোমার পাঠ্যের আলোকে যুক্তি প্রদর্শন কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধর্মগ্রন্থ

যে-গ্রন্থে ধর্ম ও কল্যাণময় জীবনের কথা উল্লেখ থাকে তাকে ধর্মগ্রন্থ বলে। বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, শ্রীমদভগবদ্গীতা, শ্রীশ্রীচর্চা প্রভৃতি আমাদের উল্লেখযোগ্য ধর্মগ্রন্থ। বেদ আমাদের আদি ও প্রধান ধর্মগ্রন্থ। বেদ চিরন্তন ও শাশ্বত। 'বেদ' মানে জ্ঞান। প্রাচীন ঋষিদের ধ্যান পাওয়া পবিত্র জ্ঞান। এ-জ্ঞান হচ্ছে জগৎ-জীবন ও তার উৎস পরমপুরুষ, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সম্পর্কে জ্ঞান। বেদকে কেন্দ্র করে রচিত ধর্মভিত্তিক বিশাল সাহিত্যকে বলা হয় বৈদিক সাহিত্য। আর মহাভারতের অংশবিশেষ শ্রীমদভগবদ্গীতা সংক্ষেপে গীতা হিসেবে পৃথক গ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে। গীতায় কর্মকে 'যজ্ঞ' বলা হয়েছে। এখানে রয়েছে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব সমন্বয় এবং বাস্তব জীবনে চলার প্রয়োজনীয় নৈতিক শিক্ষা ও উপদেশ।



এ-অধ্যায়ে বৈদিক সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, চতুর্বেদের বিষয়বস্তু ও ধর্মাচরণে তার প্রভাব এবং শ্রীমদভগবদ্গীতায় বর্ণিত চতুর্বর্ণ, কর্তব্যপালন, সাম্য, চরিত্র গঠনে মানবিক গুণাবলি এবং ভক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এ-অধ্যায়শেষে আমরা -

- ☐ • ☐ বৈদিক সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে পারব
- ☐ • ☐ চতুর্বেদের বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে ও ধর্মাচরণে তার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব
- ☐ • ☐ শ্রীমদভগবদ্গীতা অনুসারে চতুর্বর্ণ, কর্তব্যপালন, সাম্য, চরিত্রগঠনে মানবিক গুণাবলি ও ভক্তির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- ☐ • ☐ জীবন ও ধর্মাচরণে বেদ ও শ্রীমদভগবদ্গীতার শিক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে পারব।

পাঠ ১ : বৈদিক সাহিত্যের পরিচিতি

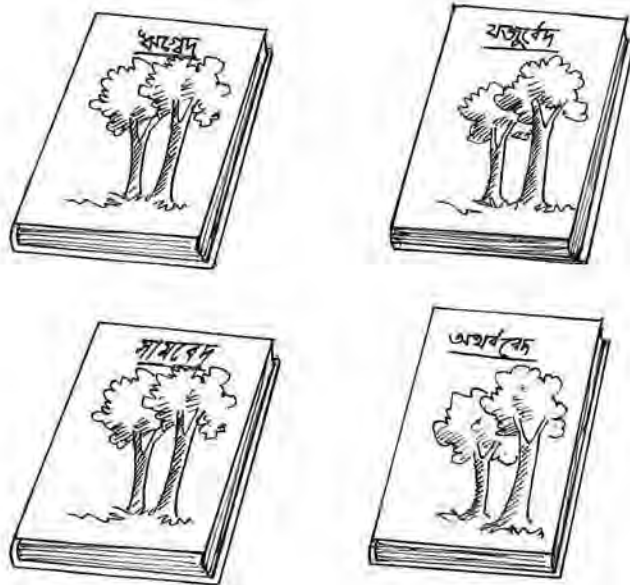
বেদ আমাদের আদি ধর্মগ্রন্থ। ‘বেদ’ মানে জ্ঞান। জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রগাঢ় চেষ্টা বা সাধনার প্রয়োজন। জ্ঞান অর্জন করতে হলে নিমগ্ন হতে হয় গভীর সাধনায়। গভীর সাধনায় নিমগ্ন হওয়াকে বলা হয় ধ্যান। যাঁরা সত্য বা জ্ঞান এবং সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাহাত্ম্য দর্শন বা উপলব্ধি করতে পারতেন, তাঁদেরকে বলা হতো ঋষি। বেদ এই ঋষিদের ধ্যানে পাওয়া পবিত্র জ্ঞান। এ হচ্ছে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এবং জগৎ ও জীবনের উৎস পরমপুরুষ, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সম্পর্কে জ্ঞান।

আমাদের জীবন, জীবনের উৎস, পরমপুরুষ, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর প্রভৃতি সম্পর্কে গ্রন্থ সমূহের মধ্যে বেদ বা সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ ও বেদাঙ্গা অন্যতম। এ-গ্রন্থ সমূহ ভিন্ন ধরনের হলেও ধর্মীয় নানা দিক থেকে পারস্পরিকভাবে সম্পর্কিত। এভাবেই বেদকে কেন্দ্র করে ধর্মভিত্তিক এক বিশাল সাহিত্য গড়ে উঠেছে। আর এ-ধর্মভিত্তিক বিশাল সাহিত্যকে বলা হয়েছে বৈদিক সাহিত্য।

বৈদিক সাহিত্যের অংশ হিসেবে যে-বিষয়গুলো এখানে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো:

চতুর্বেদ

বেদের এক নাম সংহিতা। সংহিতা মানে সংগ্রহ বা সংকলন। সমগ্র বেদ অর্থাৎ এ সংহিতাগুলোকে চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা - ১. ঋগ্বেদ সংহিতা ২. যজুর্বেদ সংহিতা ৩. সামবেদ সংহিতা এবং ৪. অথর্ববেদ সংহিতা। আর এ সংহিতাগুলোকে একত্রে বলা হয় চতুর্বেদ।



ব্রাহ্মণ

বেদের দুটি অংশ। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। বেদের যে-অংশে মন্ত্রের ব্যাখ্যা এবং বিভিন্ন যজ্ঞে তাদের প্রয়োগ বা ব্যবহারের কথা আলোচিত হয়েছে তাকে ‘ব্রাহ্মণ’ বলা হয়। ব্রাহ্মণগুলো গদ্যে রচিত।

ব্রাহ্মণের বিষয়বস্তু র মধ্যে রয়েছে বিধি অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ কর্ম অনুষ্ঠানের নির্দেশ, বেদমন্ত্রের অর্থ প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা, বিরোধী মতের সমালোচনা প্রভৃতি।

আরণ্যক

আরণ্যক এবং উপনিষদ ব্রাহ্মণের অংশ। ব্রাহ্মণে বেদের কর্মকাণ্ড আলোচিত আর আরণ্যক এবং উপনিষদে জ্ঞানকাণ্ড বিধৃত।

যা অরণ্যে রচিত তাকে আরণ্যক বলে। এখানে অরণ্য বলতে নির্জনতাকে বোঝানো হয়েছে। আরণ্যকের বিষয় ধর্মদর্শন। কার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ, সৃষ্টির উৎস কী ইত্যাদি আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। গভীর জ্ঞানকে অরণ্য বা গভীর বনের সাথে তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ গভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিষয় যাতে বর্ণিত আছে তা-ই আরণ্যক। যেমন— ঐতরেয় আরণ্যক, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য আরণ্যক।

উপনিষদ

আরণ্যকে যে-অধ্যাত্মবিদ্যার সূচনা, উপনিষদে তা আরও উচ্চতা ও গভীরতা লাভ করেছে। উপ- নি+সদ + কৃষ্ণ= উপনিষদ।



এখানে 'উপ' অর্থ সমীপে বা নিকটে, 'নি' অর্থ নিশ্চয়, 'সদ' ধাতুর অর্থ অবস্থান, প্রাপ্তি বা শিথিলীকরণ। অর্থাৎ গুরুর নিকটে বসে যে-জ্ঞান অর্জন করা হয় তাকে উপনিষদ বলে। কিন্তু এ-কথায় উপনিষদের বিষয়বস্তু স্পষ্ট হয় না। জীবের মূলীভূত সত্তা হচ্ছে তার আত্মা। এই আত্মা পরমাত্মা বা ব্রহ্মেরই অংশ। সুতরাং জীব ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ব্রহ্ম নিরাকার। কিন্তু জীবের আত্মারূপে জীবের মধ্যে তাঁর অবস্থান। তিনিই সবকিছুর মূলে। এই ব্রহ্মজ্ঞান উপনিষদের বিষয়বস্তু।

শতাব্দিক উপনিষদ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ১২ খানা উপনিষদ প্রাচীন উপনিষদ বলে খ্যাত। বাকিগুলো পরবর্তীকালের। মহাভারতের অন্তর্গত হয়েও পৃথক গ্রন্থ হিসেবে মর্যাদাপ্রাপ্ত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে উপনিষদের সার বলা হয়েছে। ঐতরেয়, কঠ, কেন, ছান্দোগ্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য উপনিষদ।

| একক কাজ : হকে প্রদত্ত প্রত্যেক প্রকার গ্রন্থ সম্পর্কে দুটি বাক্য লিখে ঘরগুলো পূরণ কর। | চতুর্বেদ | ব্রাহ্মণ | আরণ্যক | উপনিষদ |
|---|----------|----------|--------|--------|
| | | | | |

বেদাঙ্গ

বেদ পাঠের সহায়ক হিসেবে আরও কয়েক রকমের রচনা রয়েছে। বেদপাঠের অঙ্গ বলে এগুলোকে বলা হয় বেদাঙ্গ। বেদাঙ্গ বেদপাঠের সহায়ক শাস্ত্র। বেদাঙ্গের জ্ঞান না থাকলে বেদ অধ্যয়ন সম্পূর্ণ হয় না। বেদাঙ্গগুলি সূত্রাকারে রচিত। বেদাঙ্গ ছয় প্রকার। যথা— শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ।

১. **শিক্ষা**— শিক্ষা শব্দটি এখানে সামগ্রিকভাবে বিদ্যার্জন বা জ্ঞানার্জন অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। ‘শিক্ষা’ বলতে বোঝানো হয়েছে ধ্বনিতত্ত্ব, বিশেষ করে উচ্চারণতত্ত্ব নির্ভুলভাবে বৈদিক শব্দ উচ্চারণের পদ্ধতি।
২. **কল্প**— যজ্ঞাদি যার দ্বারা কল্পিত ও সমর্থিত হয় তাকে কল্প বলা হয়। ‘কল্প’ হচ্ছে নির্ভুলভাবে বৈদিক যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়াকাণ্ড অনুষ্ঠানের পদ্ধতি।
৩. **ব্যাকরণ**— ব্যাকরণে ভাষাকে বিশ্লেষণ করে সূত্রায়িত করা হয় এবং শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা হয়। ভাষা ব্যবহারের সময় তার অর্থশুদ্ধির জন্য ব্যাকরণ পাঠ করা প্রয়োজন। সে-কারণে ব্যাকরণও একটি বেদাঙ্গ।
৪. **নিরুক্ত**— নিরুক্ত নামক বেদাঙ্গে বেদে ব্যবহৃত শব্দাবলির উৎপত্তি, অর্থ ও অর্থান্ত প্রভৃতির আলোচনা করা হয়েছে।
৫. **ছন্দ**— ষড়ঙ্গ বেদাঙ্গের অন্যতম অঙ্গ হচ্ছে ছন্দ। বেদের যেসকল মন্ত্র ছন্দবদ্ধ সেগুলোর অর্থবোধ এবং যথাযথ আবৃত্তির জন্য ছন্দের জ্ঞান অপরিহার্য।
৬. **জ্যোতিষ**— বৈদিক যুগে বিশেষ বিশেষ তিথি-নক্ষত্রে বিশেষ বিশেষ বৈদিক যজ্ঞ করার ব্যবস্থা ছিল। যজ্ঞে ফলসিদ্ধির জন্য জ্যোতিষের আবশ্যিক।

একক কাজ : বেদাঙ্গের ছয়টি অঙ্গের প্রত্যেকটি সম্পর্কে একটি করে বাক্য লেখ।

নতুন শব্দ : চতুর্বেদ, কল্প, নিরুক্ত, অর্থান্ত, ছন্দ, ষড়ঙ্গ, জ্যোতিষ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ, ঐতরেয়, কঠ, কেন, ছান্দোগ্য, প্রগাঢ়, নিমগ্ন, সংহিতা, নিরুক্ত।

পাঠ ২ : চতুর্বেদের বিষয়বস্তু

বেদ ঈশ্বরের বাণী। ঋষি মনু বলেছেন— ‘বেদঃ অখিলধর্মমূলম্’ অর্থাৎ বেদ হচ্ছে সকল ধর্মের মূল। এখানে সত্য ও জ্ঞানের নানা বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। এ-সত্য বা জ্ঞান অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়। বেদে বিভিন্নভাবে ঈশ্বর ও দেবতাদের স্তুতি বা প্রশংসা করা হয়েছে। ঈশ্বরের বিভিন্ন শক্তিকে দেবতা বলে। অগ্নি, বৃষ্টি, বায়ু, উষা, রাত্রি প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির মধ্যে ঈশ্বরের অসীম ক্ষমতা উপলব্ধি করে বৈদিক ঋষিগণ তাঁদের প্রশংসা করেছেন। তাঁদের স্তুতি ও বন্দনা ঋষিদের কণ্ঠ থেকে কবিতার আকারে বাণীরূপ পেয়েছে। গভীর ধ্যানে এই বাণী বা কবিতা ঈশ্বরের অপার অনুগ্রহে ধ্যানলব্ধ ঋষিগণ ঈশ্বরের কাছ থেকে পেয়েছেন। তাই ঋষিরা বলেছেন, তাঁরা বেদ দর্শন করেছেন। এজন্য বেদকে বলা হয়েছে অপৌরুষেয়। অর্থাৎ বেদ কোনো পুরুষ বা ব্যক্তির দ্বারা সৃষ্ট নয়, তা ধ্যানে দৃষ্ট।

বেদের সঙ্গে দেবতাদের প্রসঙ্গ যুক্ত। বেদের বিষয়কে বলা হয় দেবতা। বিভিন্ন স্তুতি বা স্তুতির মাধ্যমে ঋষিগণ দেবতার মাহাত্ম্য তুলে ধরেছেন। বৈদিকযুগে উপাসনার পদ্ধতি ছিল যজ্ঞ বা হোমভিত্তিক। তখনও মূর্তি বা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে

উপাসনা করার পদ্ধতি প্রচলিত হয়নি। ঋষিগণ দেবতাদের শক্তি স্মরণ করে মন্ত্রের মাধ্যমে উপাসনা করতেন এবং অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে দেবতাকে আহ্বান করতেন।

ঋষিগণ বৈদিক দেবতাদের তিনটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করেছেন।

যথা— ১. স্বর্গের দেবতা

২. অন্তরিক্ষলোকের দেবতা

৩. পৃথিবীর বা মর্তলোকের দেবতা।



স্বর্গের দেবতা : স্বর্গের দেবতাদের ক্ষমতাই শুধু বোঝা যায়। এ-শ্রেণির দেবতারা মর্তে বা পৃথিবীতে আসেন না। তাঁরা অনেক দূরে অবস্থান করেন। এমন দেবতা হলেন বিষ্ণু, সূর্য, বরুণ প্রভৃতি।

অন্তরিক্ষলোকের দেবতা : অন্তরিক্ষলোকের দেবতাগণ স্বর্গ ও মর্তলোকের মাঝখানে অবস্থান করে না। তাঁরা মর্তে আসেন, কিন্তু থাকেন না। এরূপ দেবতা হলেন ইন্দ্র, বায়ু প্রমুখ।

মর্তলোকের দেবতা : মর্তের দেবতাদের দেখা যায়। তাঁরা পৃথিবীতে অবস্থানও করেন। এমন দেবতা হলেন অগ্নি। অগ্নিকে মর্তে পাওয়া যায় বলে তাঁকে পূজা করা হয় এবং তাঁর মাধ্যমে অন্য দেবতাদের মর্তে আহ্বান করে আনা হয়।

আগুন জ্বালিয়ে বেদের বাক্য উচ্চারণ করে দেবতাকে আহ্বান জানানো এবং প্রার্থনা করাকে বলা হয় যজ্ঞ। যজ্ঞের সময় উচ্চারিত বেদের এই বাক্যকে বলা হয় মন্ত্র। এ ছাড়া রয়েছে গান। বেদের বাক্যে সুর আরোপ করে যজ্ঞের সময় গান গাওয়া হতো। এই গানকে বলা হয় সাম। সাম মানে গান। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের বিভিন্ন প্রকার কথাও বেদে উল্লেখ আছে।

দলীয় কাজ : স্বর্গ, মর্ত ও অন্তরিক্ষের দেব-দেবীর একটি তালিকা তৈরি কর।

প্রথমে বেদ অবিভক্ত আকারেই ছিল। পরবর্তীকালে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বেদকে বিভক্ত করেন। তিনি বেদকে চার ভাগে ভাগ করেন। এগুলোকে সংহিতা বলা হয়। সংহিতা মানে সংগ্রহ বা সংকলন। এ-সংহিতাগুলো হচ্ছে—

১. ঋগ্বেদ সংহিতা ২. যজুর্বেদ সংহিতা ৩. সামবেদ সংহিতা এবং ৪. অথর্ববেদ সংহিতা। সংহিতাগুলোর বিষয়বস্তু সহ সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হলো—

ঋগ্বেদ সংহিতা

ঋক্ শব্দের অর্থ ছুঁ তি। ঋক্‌গুলোকে মন্ত্রও বলা হয়। এই ঋক্ বা মন্ত্রগুলো হচ্ছে তিন বা চার পঙ্ক্তির ছোট ছোট কবিতা। একসময়ে কবিতার মতো ঋগ্বেদের এই মন্ত্রগুলো আবৃত্তি করা হতো। সমস্ত ঋগ্বেদে এরকম ১০,৪৭২টি

ঋক্ বা মন্ত্র রয়েছে। কয়েকটি মন্ত্রের সমন্বয়ে গঠন করা হয়েছে এক-একটি সূক্ত। সমস্ত ঋগ্বেদকে দশটি মণ্ডলে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি মণ্ডলে কয়েকটি সূক্ত এবং প্রতিটি সূক্তে কয়েকটি ঋক্ রয়েছে। ঋগ্বেদে মোট ১,০২৮টি সূক্ত রয়েছে। সূক্তগুলোতে দেবতাদের স্তুতি করা হয়েছে এবং তাঁদের কাছে সুখ ও শান্তির জন্য প্রার্থনা জানানো হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইন্দ্র হচ্ছেন বৃষ্টি ও শিশিরের দেবতা। ইন্দ্রের প্রশংসা করে একটি ঋকে বলা হয়েছে—

ইন্দ্রং বয়ং মহাধন
ইন্দ্রমর্ভে হবামহে
যুজং ব্রহ্মেণু বজ্রিণম্ ॥

(ঋগ্বেদ-১ম মণ্ডল, ৭ম সূক্ত, ৫ম ঋক্)

ইন্দ্র আমাদের সহায়। শত্রুদের কাছে বজ্রধারী। আমরা অনেক সম্পদের জন্য কিংবা অল্প সম্পদের জন্যও ইন্দ্রকে আহ্বান করি।

এই মন্ত্রের দেবতা ইন্দ্র। ইন্দ্রকে নিজেদের সহায় এবং শত্রুদের কাছে শাস্তি দানকারী বজ্র নামক অস্ত্র ধারী বলে স্তুতি করা হয়েছে এবং তাঁর কাছে ধনসম্পদ প্রার্থনা করা হয়েছে। এই ঋক্ মন্ত্রটির দ্রষ্টা হলেন ঋষি মধুচ্ছন্দা।

সামবেদ সংহিতা

সাম শব্দের অর্থ হচ্ছে গান। যজ্ঞ করার সময় কোনো কোনো ঋক্ বা মন্ত্র সুর করে গাওয়া হতো। এরূপ যেসকল মন্ত্র গান করে গাওয়া হতো তাকে বলা হতো সাম। যে-বেদে গীত ঋক্ বা মন্ত্রসমূহ সংকলিত হয়েছে তাকে সামবেদ সংহিতা বলা হয়। সামবেদ থেকে প্রাচীনকালের সংগীত সম্পর্কে জ্ঞানলাভ হয়। আমরা যে সুর করে গান গাই, তার আদি উৎস এই সামবেদ। ষড়্জ, ঋষভ প্রভৃতি সমস্ত স্বরের (সরগম) উৎসও সামবেদ। প্রধানত ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলোকেই সুর দিয়ে গানের আকারে রূপদান করা হয়েছে। সামবেদ সংহিতার মন্ত্রসংখ্যা হচ্ছে ১,৮১০ টি; এগুলোর মধ্যে ৭৫টি ছাড়া বাকিগুলো ঋগ্বেদ থেকে গ্রহণ করে সুর দেওয়া হয়েছে।

যজুর্বেদ সংহিতা

যজুঃ মানে যজ্ঞের মন্ত্র। প্রাচীনকালের ঋষিরা বেদ থেকে মন্ত্র উচ্চারণ করে বা আবৃত্তি করে ধর্মানুষ্ঠান বা যাগযজ্ঞ করতেন। যজ্ঞ করার সময় উদ্দিষ্ট দেবতার সুনির্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ করা হয়। এভাবে যজ্ঞ ব্যবহৃত মন্ত্রগুলো সংগ্রহ করে যে-বেদ সংকলন করা হয়েছে তাকে যজুর্বেদ সংহিতা বলা হয়। যজ্ঞানুষ্ঠানের নিয়ম পদ্ধতি যজুর্বেদে সংকলিত হয়েছে। যজ্ঞকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বর্ষপঞ্জি বা ঋতু-সম্পর্কিত ধারণা। বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন সময়ব্যাপী যজ্ঞ করা হতো। কোনো যজ্ঞ ছিল দৈনন্দিন, কোনো যজ্ঞ ছিল সপ্তাহব্যাপী, কোনো যজ্ঞ ছিল পক্ষকালব্যাপী। আবার কোনো যজ্ঞ বর্ষব্যাপী, এমনকি দ্বাদশবর্ষব্যাপীও অনুষ্ঠিত হতো। একেক প্রকার যজ্ঞের জন্য একেক প্রকার বেদি নির্মাণ করা হতো। এই নির্মাণকৌশল থেকেই জ্যামিতি বা ভূমি পরিমাপ বিদ্যার উদ্ভব ঘটেছে।

ঋগ্বেদ ও সামবেদ পদ্য রচিত। কিন্তু যজুর্বেদে গদ্য ও পদ্য উভয় রীতিই ব্যবহৃত হয়েছে। যজুর্বেদ দুটি প্রধান শাখায় বিভক্ত। যথা— ১. কৃষ্ণ যজুর্বেদ ২. শূক্ল যজুর্বেদ। কৃষ্ণ যজুর্বেদের অপর নাম তৈত্তিরীয় সংহিতা। শূক্ল যজুর্বেদের অপর

নাম বাজসনেয়ী সংহিতা। কৃষ্ণ যজুর্বেদে ৭টি কাণ্ড ও ২১৮৪টি মন্ত্র রয়েছে। আর শূক্ল যজুর্বেদে রয়েছে ৪০টি অধ্যায় এবং ১,৯১৫টি মন্ত্র।

অথর্ববেদ সংহিতা

বেদের চতুর্থ ভাগ হচ্ছে অথর্ববেদ। অথর্ববেদ সংহিতা আধ্যাত্মিক ও জাগতিক নানাপ্রকার জ্ঞানের সংগ্রহ। অথর্ববেদের প্রাচীন নাম অথর্বাজিরস। অথর্ব বলতে ভেষজবিদ্যা, শাস্তি, পুষ্টি প্রভৃতি মঞ্জলক্রিয়া বোঝায়। আজিরস বলতে শত্রুবধ এবং বশীভূত করার উপায়, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি বোঝায়। প্রাচীনকালের চিকিৎসাপদ্ধতির আদি পরিচায়ক হিসাবে অথর্ববেদ বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। অথর্ববেদে নানাপ্রকার ব্যাধির প্রতিকারের উপায়স্বরূপ নানাপ্রকার বৃক্ষ, লতা, গুল্ম প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আয়ুর্বেদ নামে পরিচিত চিকিৎসাশাস্ত্রে র আদি উৎস এই অথর্ববেদ। এ ছাড়া এই বেদে অস্তিবিদ্যা ও শল্যবিদ্যার (সার্জারি) উল্লেখ আছে।

অথর্ববেদ সংহিতা কুড়িটি কাণ্ড, ৭৩১টি সূক্ত এবং প্রায় ৬,০০০ মন্ত্র নিয়ে গঠিত। অথর্ববেদ গদ্য ও পদ্য উভয় রীতিতে রচিত। পদ্যই বেশি। ছয় ভাগের এক ভাগ গদ্যে রচিত।

| একক কাজ : ছকে প্রদত্ত প্রত্যেক প্রকার বেদের দুটি করে বিষয়বস্তু চিহ্নিত কর | ঋগ্বেদ | সামবেদ | যজুর্বেদ | অথর্ববেদ |
|--|--------|--------|----------|----------|
| | | | | |

নতুন শব্দ : অন্তর্দৃষ্টি, অন্তরিক্ষলোক, সূক্ত, শল্য, অথর্বাজিরস, ষড়্জ, ঋষভ।

পাঠ ৩ : ধর্মাচরণে চতুর্বেদের প্রভাব

বেদ হিন্দুদের আদি ধর্মগ্রন্থ। এই বেদ একটিমাত্র ধর্মগ্রন্থ নয়। বিপুলসংখ্যক গ্রন্থের এক বিশাল ভান্ডার। হিন্দু ধর্মের মূলগ্রন্থ হচ্ছে বেদ। সেদিক থেকে বৈদিক সাহিত্যের গুরুত্বও অসীম। এ ছাড়া প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের সমাজ ও ইতিহাসের পরিচয় পেতে হলেও বৈদিক সাহিত্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। সাহিত্য হিসেবেও বৈদিক সাহিত্য গুরুত্বপূর্ণ। ঋগ্বেদে দেবতাদের প্রশংসা করা, যজুর্বেদে যজ্ঞের বিষয়বস্তু সহ সমাজকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

বেদ পাঠ করলে সৃষ্টি, বিশৃঙ্খলিত ও জীবন সম্পর্কে জ্ঞানলাভ হয়। প্রত্যেকটি বেদের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ঋগ্বেদ সংহিতা পাঠ করলে আমরা বিভিন্ন বৈদিক দেব-দেবী সম্পর্কে জানতে পারি। অগ্নি, ইন্দ্র, উষা, রাত্রি, বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরের অসীম ক্ষমতা উপলব্ধি করা যায়। তাঁদের কর্মচাঞ্চল্যকে আদর্শ করে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

যজুর্বেদ যজ্ঞের মন্ত্রের সংগ্রহ। এ থেকে জানতে পারি সেকালে উপাসনাপদ্ধতি কেমন ছিল। যজুর্বেদ অনুসরণে বিভিন্ন সময়ে যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে বর্ষপঞ্জি বা ঋতু সম্পর্কে ধারণা জন্মে। বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন সময়ব্যাপী যজ্ঞানুষ্ঠান করা হতো। যজ্ঞের বেদি নির্মাণের কৌশল থেকেই জ্যোতিষ বা ভূমি পরিমাপ বিদ্যার উদ্ভব ঘটেছে।

সামবেদ থেকে সেকালের গান ও রীতি সম্পর্কে জানতে পারি। জগতের সমস্ত গানের আধার এবং উৎস সামবেদ। আর এ-গান অর্থাৎ সামবেদ আমাদের মননশীলতাকে বাড়িয়ে দেয়। ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে না।

অথর্ববেদ সংহিতায় ইন্দ্রজাল, ব্যাধি নিরাময়, অনাবৃষ্টি হ্রাস, ঔষজবিদ্যা, শান্তি ও নানাবিধ শুভকর্মসংক্রান্ত মন্ত্রাদি ও নির্দেশনা রয়েছে। জীবনকে সুন্দর, সুস্থ রাখার উপায় হিসেবে ঔষজবিদ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যা-ই ঔষজ তা-ই অমৃত। আর যা অমৃত তা-ই ব্রহ্ম। এই অথর্ববেদ হচ্ছে আয়ুর্বেদ বা চিকিৎসাবিজ্ঞানের মূল। এখানে নানাপ্রকার রোগব্যাধি এবং সেগুলোর প্রতিকারের উপায়স্বরূপ নানাপ্রকার লতা, গুল্ম বৃক্ষাদির বর্ণনা করা হয়েছে।

সুতরাং সমগ্র বেদপাঠে পরমাত্মা, বৈদিক দেবদেবী, যজ্ঞ, সজ্জী৩, চিকিৎসাসহ নানা বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে জীবনকে সুন্দর, সুস্থ ও পরিপাটি করে গেলা যায়। আর এজন্যই এ-গ্রন্থ আমাদের প্রত্যেকের পাঠ করা অবশ্যকর্তব্য।

একক কাজ : বেদের শিক্ষা তুমি কীভাবে জীবনচরণে প্রয়োগ করবে।

নতুন শব্দ : কর্মচারজ্ঞা, বর্ষপঞ্জি, স্রলুপ, গুল্ম।

পাঠ ৪ : শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিষয়বস্তু

মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত ২৫ থেকে ৪২ এই আঠারোটি অধ্যায় একত্রে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সংক্ষেপে গীতা নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এখানে সর্বমোট সাতশত শ্লোক আছে। এজন্য এর আর এক নাম সপ্তশতী। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যেসব কথা বলেছেন তারই নাম শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সংক্ষেপে গীতা।

ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু-দুই ভাই। ধৃতরাষ্ট্র বড়, পাণ্ডু ছোট। কুব্জবংশের নাম অনুসারে ধৃতরাষ্ট্রের সন্তানদের বলা হয় কৌরব। কিন্তু একই বংশ হয়েও পাণ্ডুর নাম অনুসারে তাঁর সন্তানদের বলা হয় পাণ্ডব। রাজ্য নিয়ে এই কুব্জ-পাণ্ডবের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের রথের সারথি হয়েছিলেন। রথ যখন দুপক্ষের সৈন্যদের মাঝখানে রাখা হলো তখন অর্জুন স্বপক্ষ এবং বিপক্ষের নিকট আত্মীয়-স্বজনদের দেখে যুদ্ধে পড়লেন। অতি নিকট আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি প্রভৃতি সশরকে বিভিন্ন উপদেশ দেন। সেই উপদেশবাহীই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বর্ণিত হয়েছে। উপলক্ষ অর্জুন হলেও গীতার ভগবান যে- উপদেশ দিয়েছেন, তা সকল কালের সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। গীতা সকল উপনিষদের মূলতত্ত্ব অবলম্বনে রচিত— জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিযোগের এক অপূর্ব সমন্বয়। কেবল ধর্মগ্রন্থরূপেই নয়, দার্শনিক কাব্যগ্রন্থরূপেও গীতা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। গীতা নিত্য পাঠ্য গ্রন্থ।



একক কাজ : শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিষয়বস্তু লেখ।

নতুন শব্দ : কৌরব, পাণ্ডু।

পাঠ ৫ : শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় চতুর্বর্ণ, কর্তব্যপালন, সাম্য ও ভক্তি

চতুর্বর্ণ

ভগবান মানুষকে সমানভাবে সৃষ্টি করেছেন। তার পরও গুণ ও কর্মানুযায়ী তাঁর সৃষ্টিতে সমাজে চারটি বর্ণ বিভাগ রয়েছে। এগুলো হচ্ছে— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ব্রহ্মাজ্ঞানে বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন ব্যক্তি হচ্ছেন ব্রাহ্মণ, যিনি সত্ত্ব গুণ দ্বারা প্রভাবিত। শাসক কিংবা যুদ্ধকারী সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি হচ্ছেন ক্ষত্রিয়, তিনি রজঃ গুণ দ্বারা প্রভাবিত। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি হচ্ছেন বৈশ্য, যিনি রজঃ ও তমঃ গুণ দ্বারা প্রভাবিত। শ্রমজীবী সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি হচ্ছেন শূদ্র, তিনি তমঃ গুণ দ্বারা প্রভাবিত। এই যে বর্ণবিভাজন, এটি কিন্তু জন্মভেদে নয়, কর্মভেদে। যে যেরকম কাজ করে থাকে তার বর্ণটি সে অনুসারে হয়। এ-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন— চতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ, অর্থাৎ প্রকৃতির গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে আমিই চারটি বর্ণ সৃষ্টি করেছি। ব্রাহ্মণের সন্তান হলেই যে একজন ব্রাহ্মণ হবে এমনটি নয়। সত্ত্বগুণ প্রভাবিত কোনো শূদ্রের সন্তানও ব্রাহ্মণ হতে পারেন। আবার কোনো ব্রাহ্মণের সন্তান তমঃ গুণে প্রভাবিত হলে সে শূদ্র বলে গণ্য হবে। সুতরাং বলা যায়, জাতি বা বর্ণভেদ বংশগত নয়, গুণ ও কর্মভিত্তিক।

কর্তব্যপালন

যা কিছু করা হয় তা-ই কর্ম। আর যেসকল কর্ম করা আবশ্যিক তা-ই কর্তব্য। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কর্তব্যপালনকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আর এ-কর্তব্যপালন করতে হবে নিষ্কামভাবে অর্থাৎ কোনোপ্রকার ফলের আশা না করে কর্তব্যপালন করা।

এ-প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

‘কর্মে তব অধিকার কর্মফলে নয়,
ফল আশা ত্যাগ কর, কর্ম যেন রয়।’— গীতা, ২/৪৭

তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, ‘কর্ম অর্থাৎ কর্তব্যপালনই ধর্ম। তুমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধের মাঠে যুদ্ধ করাই তোমার ধর্ম। আসক্তিবিনাশে যুদ্ধ কর, একটি সুফল পাবে। তুমি যুদ্ধ না করলে তোমার ধর্ম নষ্ট হবে। কেননা স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য অনুসারে কর্ম সম্পাদন করাই ধর্ম।’

সুতরাং আমরা যে যেই অবস্থানে আছি, সেকাজগুলো সঠিকভাবে সম্পাদন করাই আমাদের প্রকৃত ধর্ম। যেমন— ‘ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ’ ছাত্রদের একমাত্র কর্তব্য অধ্যয়ন করা।

সাম্য

সাম্য বা সমত্ব মানে সমান। সকলকে সমান দেখার নাম সাম্যচেতনা। সকল জীবের মধ্যে ঈশ্বর সমানভাবে বিরাজমান। সুতরাং সকল জীবকে এই যে সমতার দৃষ্টিতে দেখা এবং সমতাপূর্ণ আচরণ করা এরই নাম সাম্যবোধ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, সর্ববিষয়ে সকলের প্রতি যাঁর আচরণ সমতাপূর্ণ, তিনিই শ্রেষ্ঠ (৬/৯)। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আরও বলা হয়েছে, সমদর্শী সর্বভূতে আত্মকে দেখেন এবং আত্মায় সর্বভূতকে দেখেন (৬/২৯)। এর অর্থ হলো, যিনি সমদর্শী তিনি সকল জীবকে নিজের মতো মনে করেন এবং নিজেকে সকলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন। সুতরাং আমরাও সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখব। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা থেকে আমরা সাম্য সম্পর্কে এ-শিক্ষা পাই।

ভগবানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা বা ভালোবাসাকে ভক্তি বলা হয়। ভক্ত ভগবানের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে তাঁর সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করেন। তাই বলা হয় ভক্তি হচ্ছে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে মিলন সেতু।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে ভক্ত কামনা-বাসনা মুক্ত হবেন। তাঁর সমস্ত কর্মের ফল ঈশ্বরের উদ্দেশে নিবেদন করবেন। যিনি এভাবে ভগবানে আত্মনিবেদন করেন, তাঁর অন্তরে ভক্তি জন্মে এবং ভক্তিতেই মুক্তি।

একক কাজ : কর্ম, সাম্য ও ভক্তি সম্পর্কে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শিক্ষার প্রভাব সম্পর্কে লেখ।

নতুন শব্দ : সত্ত্বা, রজা, তম, ক্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, আসক্তি, তপা, সাম্য, সমদর্শন।

পাঠ ৬ : জীবনাচরণে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শিক্ষা

গীতা আমাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার প্রেরণা দেয়। কারণ সৃষ্টি ভগবানই যুগেযুগে দুষ্কের দমন, শিষ্কের পালন এবং ধর্মরক্ষার জন্য পৃথিবীতে অবতাররূপে নেমে আসেন।

তিনি বলেছেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য গুণির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মনং সৃজ্যামহম্॥
পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ গীতা- ৪/৭-৮

অর্থাৎ যখনই ধর্মের অধঃপতন এবং অধর্মের উদ্ভব হয়, তখনই সাধুদের পরিভ্রাণ, দুষ্কলোকদের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপন করার জন্য আমি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হই।

আত্মার ধ্বংস নেই। - গীতার এই শিক্ষা আমাদের মৃত্যুকে ভয় না করে ভালো কাজে এগিয়ে যাওয়ার সাহস যোগায়।

গীতায় বলা হয়েছে- ১. শ্রদ্ধাবান ও সংযমীই জ্ঞানলাভে সমর্থ হয় ২. অনাসক্ত কর্মযোগী মোক্ষ লাভ করেন ৩. জ্ঞানীভক্তই তাঁকে হৃদয়ে অনুভব করেন এবং ৪. এই বিশাল বিশ্বে যা কিছু আছে সবই ঈশ্বরের মধ্যে বিদ্যমান।

গীতার এই কথা থেকে আমরা শ্রদ্ধা ও সংযম সাধনার দিকে মনোনিবেশ করি। জাগতিক বিষয়ের প্রতি নির্মোহ হওয়ার প্রেরণা পাই। ধর্ম অনুশীলনের কাজে প্রবৃত্ত হই অর্থাৎ অর্থহীন গতানুগতিক পথ পরিহার করে তত্ত্বের মর্মার্থ বোঝার চেষ্টা করি। সবকিছু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্গত সকল ভেদবুদ্ধি দূর করে দিয়ে আমরা অন্যকে ভালোবাসতে চেষ্টা করি। যে যেভাবে বা যে-পথে ঈশ্বরকে ডাকতে চায়, ঈশ্বর সেভাবেই তার ডাকে সাড়া দেন। এখানেই বেজে ওঠে ধর্মসম্বন্ধের সুর।

গীতায় জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয় করা হয়েছে। জ্ঞানের আলোকে মনকে আলোকিত করতে হবে। তার জন্য কর্ম করতে হবে। এ-কর্ম হবে নিষ্কাম। আর সমস্ত নিষ্কাম কর্মের ফল ভগবানে সমর্পণ করতে হবে। একেই বলে ভক্তি। এ-তিনের সমন্বয়ে জীবনপথে চলতে হবে। সুতরাং গীতায় বাস্তব জীবনে কীভাবে চলতে হবে সেই পথও দেখানো হয়েছে। সামগ্রিক বিচারে আমাদের জীবনাচরণে অন্যতম ধর্মগ্রন্থ হিসেবে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার গুরুত্ব অপরিসীম।

একক কাজ : শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শিক্ষা উপলব্ধি করে পাঁচটি বাক্য লেখ।

নতুন শব্দ : অভ্যুত্থান, শ্রদ্ধাবান, সংযমী, অনাসক্ত, কর্মযোগী, মোক্ষ।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. বেদ ঋষিদের পাওয়া পবিত্র জ্ঞান ।
২. সকল উপনিষদের সার ।
৩. সংগীতের অন্যতম আদি উৎস ।
৪. মর্ত্যলোকের দেবতা হলেন ।
৫. যজ্ঞানুষ্ঠানের নিয়ম পদ্ধতি সংকলিত ।
৬. অথর্ববেদের প্রাচীন নাম ।

ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর :

| বাম পাশ | ডান পাশ |
|----------------------------------|---------------------------------|
| ১. বেদকে কেন্দ্র করে ধর্মভিত্তিক | চতুর্বেদ |
| ২. বেদাঙ্গের জ্ঞান না থাকলে | ভূমি পরিমাপ বিদ্যার উদ্ভব ঘটেছে |
| ৩. সংহিতাগুলোকে একত্রে বলা হয় | গুণ ও কর্মগত |
| ৪. যজ্ঞের বেদি নির্মাণকৌশল থেকেই | সংকলন |
| ৫. জাতি বা বর্ণভেদ বংশগত নহে | বেদ অধ্যয়ন সম্পূর্ণ হয় না |
| | এক বিশাল সাহিত্য গড়ে উঠেছে |

নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১. বৈদিক সাহিত্য বলতে কী বোঝায় ?
২. বেদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে ব্রাহ্মণের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা কর ।
৩. সংগীতচর্চায় সামবেদ সংহিতার ভূমিকা ব্যাখ্যা কর ।
৪. যজুর্বেদ থেকে কীভাবে বর্ষপঞ্জি ও ভূমি পরিমাপ সম্পর্কে জানা যায় ?
৫. চতুর্বেদ সম্পর্কে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শিক্ষা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর ।

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. ‘বেদ অধ্যয়নে বেদাঙ্গের গুরুত্ব অপরিসীম’-উক্তিটি বিশ্লেষণ কর ।
২. ঋগ্বেদ সংহিতার বিষয়বস্তু উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর ।
৩. ‘আমাদের প্রত্যেকের চতুর্বেদ পাঠ করা আবশ্যিক’ - উক্তিটি মূল্যায়ন কর ।
৪. ‘জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিব্যোমের এক অপূর্ব সমন্বয় হচ্ছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা’ - বিশ্লেষণ কর ।

৫. সাম্য ও ভক্তি সম্পর্কে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শিক্ষা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।
৬. আমাদের জীবনচরণে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. সংহিতা মানে -

| | |
|-----------|----------|
| ক. গান | খ. যজ্ঞ |
| গ. সংগ্রহ | ঘ. সমীপে |
২. বেদাঙ্গের অন্যতম অঙ্গ কোনটি ?

| | |
|-----------|------------|
| ক. কল্প | খ. ছন্দ |
| গ. শিক্ষা | ঘ. নিরুক্ত |
৩. ইন্দ্র, বায়ু প্রমুখ দেবতারা পৃথিবীতে -
 - i. আসেন না
 - ii. অবস্থান করেন
 - iii. আসেন কিন্তু থাকেন না

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|--------|------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. i ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

সীমা দীর্ঘদিন যাবৎ বাতের ব্যথায় ভুগছিল। অনেক চিকিৎসার পরও উপশম হচ্ছে না বিধায় সে জগতপুর গ্রামের আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক জিতেনবাবুর শরণাপন্ন হয় এবং তাঁর ব্যবস্থাপনায় ছয় মাস চিকিৎসার পর সীমা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে।

জিতেনবাবুর চিকিৎসাপদ্ধতি কোন বেদের অন্তর্গত ?

- | | |
|-------------|-------------|
| ক. ঋগ্বেদ | খ. সামবেদ |
| গ. যজুর্বেদ | ঘ. অথর্ববেদ |

ধর্ম ও জীবনচরণে উক্ত বেদের ভূমিকা হচ্ছে -

- i. অনাবৃষ্টি রোধ
- ii. ব্যাধি নিরাময়
- iii. শান্তি ও শুভকর্মের মন্ত্রাদির নির্দেশনা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

পুলিনবাবু অত্যন্ত নীতিবান ও ধার্মিক মানুষ। তিনি শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত থেকে ছেলেমেয়েদের যথাযথভাবে লালনপালন করছেন। তবে ছেলেমেয়েরা প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাঁকে সুখে রাখবে এরূপ প্রত্যাশা তাঁর নেই। তিনি অনুভব করেন এ-সংসারে নিঃস্বার্থভাবে দায়িত্ব পালন করাই প্রকৃত ধর্ম। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরও তিনি নিজের সন্তানের মতোই গড়ে তুলতে সহায়তা করেন। শিক্ষার্থীরাও তাঁকে পিতৃতুল্য গভীর শ্রদ্ধা করে।

ক. গভীর সাধনায় নিমগ্ন হওয়াকে কী বলে ?

খ. বেদকে কেন অপৌরুষেয় বলা হয়েছে ? ব্যাখ্যা কর।

গ. পুলিনবাবুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে শ্রীমদ্ভগবদগীতার কোন শিক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে তা তোমার পঠিত বিষয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি কি মনে কর পুলিনবাবুর পক্ষে মোক্ষলাভ সম্ভব ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

তৃতীয় অধ্যায়

হিন্দুধর্মের স্বরূপ ও বিশ্বাস

সংস্কৃত ধৃ-ধাতুর সঙ্গে মন্ প্রত্যয় যুক্ত করে ধর্ম শব্দটি গঠিত হয়েছে। এর অর্থ যা ধারণশক্তিসম্পন্ন, সেটিই ধর্ম। হিংসা না করা, চুরি না করা, সত্যনিষ্ঠ হওয়া, দেহমনে পবিত্র থাকা এবং সংযমী হওয়া- এ-পাঁচটি গুণ নিয়ে হিন্দুধর্মের সাধারণ লক্ষণ। আবার ধর্ম-অধর্ম নির্ণয়ে পবিত্র বেদ, স্মৃতিশাস্ত্র, সদ্ধাক্তিদের আচার-আচরণ এবং বিবেকের নির্দেশ এই চারটি হচ্ছে হিন্দুধর্মের বিশেষ লক্ষণ। বহু যুগের বহু সাধকের সাধনার ফসল নিয়ে এ-ধর্ম ক্রমশ বিকশিত হচ্ছে। হিন্দুধর্ম বহুকালের ধর্ম। চলার পথে মারো মারো নতুন ধর্মীয় চিন্তা এতে প্রবেশ করেছে। এ-ধর্মের বিধিবিধান অনুশীলন করে জীবনকে সুন্দর ও শান্তিময় করা যায়।



সমাজজীবনে কর্ম বা জীবিকা অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র-এ-চতুর্বর্ণের সৃষ্টি হয়। এ-বর্ণভেদ ছিল পেশাগত, জন্মগত নয়। মানুষের পূর্ণজা জীবনকাল ধরা হয় শতবর্ষ। সমস্ত সময়টিকে চার ভাগে ভাগ করা হয়- ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস। একে বলা হয় চতুরাশ্রম।

হিন্দুধর্মে যুগবিভাগ রয়েছে- সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। প্রতিটি যুগের জন্য নির্দিষ্ট ধর্মকর্মের কথা রয়েছে- সেগুলো যুগধর্ম। পবিত্র দেহমন নিয়ে ধর্মচর্চা করতে হয়। এজন্য পূজা, উপবাস, প্রার্থনা, উপাসনা ইত্যাদি আচার-অনুষ্ঠানের অনুশীলন করতে হয়। হিন্দুধর্মে ব্রতপালনের ব্যবস্থা রয়েছে। ভক্তগণ ব্রতপালন করে পাপমুক্ত হয়ে থাকে। ঈশ্বরে বিশ্বাস, পূজা, পার্বণ ও ব্রতপালনের মধ্য দিয়ে ধর্মের সুফল পাওয়া যায়।

আমরা এ-অধ্যায়ের দুটি পরিচ্ছেদের প্রথম পরিচ্ছেদে হিন্দুধর্মের সাধারণ ও বিশেষ লক্ষণ এবং হিন্দুধর্মের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে অবগত হব এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণ ও আশ্রমধর্মের ধারণা, বর্ণভেদ জন্মগত নয়, পেশাগত- এ-ধারণা, যুগধর্ম, ব্রতপালন, ব্রতপালনে করণীয়, শিবরাত্রির ব্রতকথা এবং ব্রতপালনের গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত হব।

এ-অধ্যায়শেষে আমরা-

- হিন্দুধর্মের সাধারণ ও বিশেষ লক্ষণসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব
- হিন্দুধর্মের ক্রমবিকাশ সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করতে পারব
- জীবনাচরণে হিন্দুধর্মের সাধারণ ও বিশেষ লক্ষণের প্রকাশ ঘটাতে পারব
- বর্ণ ও আশ্রমের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- বর্ণ ও আশ্রমধর্মের বর্ণনা করতে পারব
- বর্ণভেদ পেশাগত, বংশানুক্রমিক নয় - ব্যাখ্যা করতে পারব
- যুগধর্মের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- ব্রতপালনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- শিবরাত্রির ব্রতকথা বর্ণনা করতে পারব
- ব্রত ও ব্রতপালনে করণীয় ও ব্রতপালনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- বর্ণে বর্ণে কোনো ভেদ নেই তা উপলব্ধি করে নিজ আচরণে তার প্রকাশ ঘটাতে পারব
- ব্রতপালনের গুরুত্ব সম্পর্কে জেনে ব্রতপালনে উদ্বুদ্ধ হব।

প্রথম পরিচ্ছেদ

হিন্দুধর্মের স্বরূপ

হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে ধর্মের লক্ষণসমূহকে সাধারণ লক্ষণ ও বিশেষ লক্ষণ- এ-দুভাগে ভাগ করা হয়েছে :

পাঠ ১ : ধর্মের সাধারণ লক্ষণ

সংস্কৃত ধৃ-ধাতুর সঙ্গে মন্ প্রত্যয়যোগে ধর্ম শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে। ধৃ-ধাতুর অর্থ ধারণ করা। তাহলে ধর্ম শব্দটিতে বোঝাচ্ছে ধারণশক্তি। এ- প্রসঙ্গে মহাভারতের শান্তি পর্বে বর্ণিত ধর্মের লক্ষণটি স্মরণ করা যায়।

‘ধারণাদ্ ধর্ম ইত্যাহুর্ধর্মেণ বিধৃতা প্রজাঃ।

যঃ স্যাদ্ ধারণ সংযুক্তঃ স ধর্ম ইতি নেতরঃ ॥’

অর্থাৎ, ধারণ ক্রিয়া (ধৃ+মন) থেকে ধর্ম শব্দের উৎপত্তি। ধর্ম সৃষ্টিকে বিশেষভাবে ধারণ করে রয়েছে। সংক্ষেপে যা কিছু ধারণশক্তিসম্পন্ন তা-ই ধর্ম। এ ছাড়া অন্যকিছু ধর্ম নয়। যেমন- মানুষের ধর্ম হচ্ছে মনুষ্যত্ব। আর এই মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে-

অহিংসা সত্যমস্তে যৎ শৌচং সংযমমেব চ।

এতৎ সামাসিকং প্রোক্তং ধর্মস্য পঞ্চ লক্ষণম্ ॥ (মনুসংহিতা)

অর্থাৎ, হিংসা না করা, চুরি না করা, সংযমী হওয়া, পবিত্র থাকা এবং সত্যবাদী হওয়া- এই পাঁচটিকে মনুষ্যত্বের লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে মনুষ্যত্ব রয়েছে পাঁচটি গুণের মধ্যে। গুণগুলো অনুশীলন করে একজন মানুষ মনুষ্যত্বের অধিকারী হতে পারে। যদি দেখা যায় একজন মানুষ অন্যকে হিংসা করেন না, অপরের সম্পদ চুরি করেন না, জীবনে সত্যকে ধরে রেখেছেন, পোশাক-পরিচ্ছদে পবিত্র, চিন্তাভাবনায় পরিশুদ্ধ এবং জীবনধারণের প্রতিটি ক্ষেত্রে সংযমী, তাহলে ঐ ব্যক্তিকে আমরা মনুষ্যত্বের অধিকারী বলব। আর এরূপ পরিশোধিত ব্যক্তিই হবেন হিন্দুধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে আদর্শ মানুষ। উক্ত পাঁচটি গুণই মানুষকে মানুষ করেছে। তাই এগুলো হিন্দুধর্মের মনুষ্যত্বের লক্ষণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়। ধর্ম ধার্মিককে রক্ষা করে। ধর্ম নষ্ট হলে মানুষের ক্ষতি হয়।

একক কাজ : ধর্মের সাধারণ লক্ষণ তোমার বাস্তব জীবনে কীভাবে প্রয়োগ করবে লেখ।

নতুন শব্দ : সংযমী, মনুষ্যত্ব, স্মরণ, পরিশুদ্ধ।

পাঠ ২ ও ৩ : ধর্মের বিশেষ লক্ষণ

ধর্মের সাধারণ লক্ষণ বর্ণনার পর ধর্মের বিশেষ লক্ষণসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। ধর্মের বিশেষ লক্ষণ সম্পর্কে মনুসংহিতায় বলা হয়েছে :

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্যাচ প্রিয়মাত্মনঃ ।

এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাৎ ধর্মস্য লক্ষণম্ । (২/১২)

অর্থাৎ, বেদ, স্মৃতিশাস্ত্র, সদাচার ও বিবেকের বাণী – এই চারটি ধর্মের বিশেষ লক্ষণ। এই চারটিকে অনুসরণ করে কোনটা ধর্ম, কোনটা অধর্ম তা নির্ণয় করা যায়।

বেদ

সনাতন ধর্মের ভিত্তিমূলে রয়েছে বেদ। বেদ আদি ধর্মগ্রন্থ। বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান। বেদের ঋষিগণ ধ্যানস্থ হয়ে ভগবানের বাণী লাভ করেছেন এবং সে- বাণীসমূহ কালক্রমে লিপিবদ্ধ হয়ে বেদগ্রন্থ হয়েছে। আমরা জানি বেদ চারটি। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ। জীবনক্ষেত্রে কোনটা ধর্ম, কোনটা অধর্ম এটা মীমাংসার প্রশ্নে বেদের মতকেই গ্রহণ করতে হয়।



স্মৃতিশাস্ত্র

বেদের পরে সর্বকম কর্তব্যকর্মের উপদেশ দিয়ে রচিত হয় স্মৃতিশাস্ত্র। স্মৃতিশাস্ত্র গুলো রচিত হয়েছে বেদের নির্ধারিত মতামত ঠিক রেখে। স্মৃতিশাস্ত্রে র নিয়ম, নির্দেশ মেনে চললে ধর্মধর্ম নির্ণয় করা সহজ হয়।

সদাচার

সৎ + আচার = সদাচার। সৎ ব্যক্তির আচার আচরণে ধর্মের প্রকাশ ঘটে থাকে। বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রে র মাধ্যমে যদি ধর্ম ও অধর্ম নির্ণয় করা সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে সমাজে মহাপুরুষদের আচার-আচরণ ও উপদেশ-নির্দেশ অনুসরণ করাই ধর্ম।

বিবেকের বাণী

উপরের আলোচিত বেদ, স্মৃতিশাস্ত্র ও সদাচার অনুসরণ করেও যদি বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে ধর্ম-অধর্ম নির্ণয় করা সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে মানুষকে তার নিজস্ব বিবেকের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। মানুষের পরিচয়ে বলা হয় মানুষ বিবেকবান প্রাণী। তাই বিবেকবুদ্ধি অবলম্বন করে জীবনপথে চলতে হয়। সর্বক্ষেত্রে ধর্মনির্দেশ মেনে চলা মজালজনক

নাও হতে পারে। যেমন- শাস্ত্রে র নির্দেশ হচ্ছে সত্য কথা বলা ধর্ম, আর মিথ্যা বলা পাপ। এ-নির্দেশ সকল ক্ষেত্রে অনুসরণ করা সম্ভব নাও হতে পারে। যদি দেখা যায় মিথ্যা বললে একজন ভালো মানুষের জীবন রক্ষা হয়, তখন মিথ্যা বলাই ধর্ম। এরূপ ক্ষেত্রে সত্য বলা ধর্ম নয়। এরূপ জটিল পরিস্থিতিতে মানুষের অন্তরে অবস্থিত ঈশ্বর বা বিবেকের নির্দেশ নিয়ে ধর্মধর্ম নির্ণয় করতে হয়।

পাঠ ৪ ও ৫ : হিন্দুধর্মের ক্রমবিকাশ

মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সনাতন তথা হিন্দুধর্মের বিকাশ শুরু হয়েছে। হিন্দুধর্মে চিন্তাশীল মুনি-ঋষিগণ মানুষের কল্যাণচিন্তায় ধর্মীয় আচার-আচরণে এমনকি পারমার্থিক চিন্তায় নতুন নতুন ধর্মীয় ভাব প্রবর্তন করেছেন। বৈদিক যুগে ধর্ম কর্ম নির্ধারিত ছিল যজ্ঞকর্ম রূপে। যজ্ঞক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বৈদিক যুগে দেবতাদের আরাধনা করা হতো। যজ্ঞকর্মের ফল স্বর্গপ্রাপ্তি হতে পারত কিন্তু মানুষের মুক্তিলাভ হতো না। তাই বেদের পরে উপনিষদের যুগে মুক্তির চিন্তা প্রাধান্য পায়। মানুষ মুক্তিলাভের জন্য এক ব্রহ্মের আরাধনা করতে থাকে। এ-সময় সমাজে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণের প্রবণতা দেখা দেয়। কালক্রমে এ-চিন্তার মধ্যেও মানুষ যেন সন্তুষ্ট হতে পারল না। এ-অবস্থায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়। তখন ছিল দ্বাপর যুগ। সমাজজীবনে সন্ন্যাসের পরিবর্তে কর্মের দিকে মোড় ফেরানো হলো। তিনি ব্যাখ্যা করে বললেন, কর্ম ত্যাগ নয়, কর্ম করতে হবে ভোগ-আকাজ্জিকা বাদ দিয়ে। মনে করতে হবে সমস্ত বিশৃঙ্খল ভগবানের বিরাট কর্মক্ষেত্র। আর এখানে মানুষ ভগবানের কর্ম করে যাচ্ছে এবং কর্মের ফলও ভগবানেরই প্রাপ্য। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এই নিষ্কাম তথা কর্মযোগের বিষয়টি বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরা হয়েছে। কর্মযোগ অনুশীলন করে মানুষ মুক্তিলাভ করতে পারে।

এরপর আসে ভক্তিবাদের কথা। মানুষ ঈশ্বরকে সাকারে উপাসনা করতে থাকে। বহু দেব-দেবীর পূজা-পার্বণ হিন্দুসমাজে চলতে থাকে। ভগবানকে সাকারে আরাধনা করে ভক্তরা মুক্ত হতে পারে। তবে ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবীর উপাসকগণ সমাজে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যেমন- শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব ইত্যাদি। এই সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে অসহিষ্ণু ভাব দেখা দেয়। এরূপ অবস্থায় শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটে। তিনি প্রেমভক্তিমূলক বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। এ-ধর্মের প্রধান লক্ষ্য ভক্তির মাধ্যমে ভগবানের আরাধনা, সমাজে বর্ণবিভেদ দূর করা ও শান্তি স্থাপন করা।

উনবিংশ শতকে এসে বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ দিয়ে হিন্দুধর্মে অনেক আচার আচরণে সংস্কার সাধন করা হয়। মূর্তিপূজার পরিবর্তে আসে এক ব্রহ্ম চিন্তা। আর স্থাপিত হয় ব্রাহ্মসমাজ। অপরদিকে মূর্তিপূজার মাধ্যমে যে মানুষ ঈশ্বর লাভ করতে পারে, এ-ভাবটি শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের প্রচেষ্টায় হিন্দুধর্মে পুরাতন ও নতুন চিন্তাধারার সময় ঘটে।

সংক্ষেপে হিন্দুধর্মের বিকাশ ঘটেছে বৈদিক যুগে, যজ্ঞ কর্মে, বেদান্তের ব্রহ্মসাধনায়, পৌরাণিক যুগের দেব-দেবীর উপাসনায়, দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণের কর্মযোগে, শ্রীচৈতন্যের ভক্তিবাদনায়; আর আধুনিক কালে শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্ম সময়ের মধ্য দিয়ে।

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, তাঁর ভাব অনন্ত, তাঁকে পাওয়ার পথও বিচিত্র। সাধনপথে যে-কোনো প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে মানবের কল্যাণের জন্যই ধর্ম। ধর্মচরণে মানবকল্যাণকে অবশ্য প্রাধান্য দিতে হবে। মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর রয়েছেন; তাই মানবসেবাই ঈশ্বরসেবা। এই ধর্মবোধে বিশ্বাসী হয়ে আমরা জীবনে সেবামূলক অনুশীলন করব এবং মানবতাবোধ জাগ্রত করতে যত্নবান হব।

দলীয় কাজ : ধর্মের বিশেষ লক্ষণসমূহ তোমাকে মানবতাবোধে কীভাবে উদ্ভূত করেছে এ-সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

নতুন শব্দ : স্মৃতিশাস্ত্র, বেদগ্রন্থ, বেদান্ত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ধর্ম বিশ্বাস

পাঠ ১ : বর্ণভেদ

আমরা হিন্দুধর্মের বিশেষ লক্ষণ এবং হিন্দুধর্মের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে অবগত হয়েছি। এখন বর্ণের ধারণা সম্পর্কে অবগত হব।

হিন্দুধর্মের মূল ধর্মগ্রন্থ বেদ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণের কথা বেদ থেকেই জানা যায়। সমাজে সকল মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, কর্মদক্ষতা সমান নয়। কর্মের যোগ্যতা অনুসারে প্রাচীনকাল থেকে এ-ধর্মে বর্ণবিভাগ রয়েছে। সমাজে যারা জ্ঞান-বুদ্ধিতে উন্নত তারা ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হয়। এঁরা জ্ঞান অর্জন, জ্ঞান বিতরণ এবং ধর্মকর্মে নিযুক্ত থাকতেন। আবার রাজকার্যে কুশলী, দেশকে রক্ষা করার শক্তিতে দক্ষ, এই শ্রেণির লোকদেরকে বলা হতো ক্ষত্রিয়। ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা, শস্যাদি উৎপাদনকর্মে উৎসাহী ব্যক্তিরাই হলেন বৈশ্য। শ্রমজীবী ব্যক্তিদেরকে শূদ্র শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

পাঠ ২ : বর্ণভেদ পেশাগত, বংশানুক্রমিক নয়

কালক্রমে এই বর্ণপ্রথা জন্মগত হয়ে দাঁড়ায়, যেমন – ব্রাহ্মণের সন্তান হয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের সন্তান হয় ক্ষত্রিয়, অনুরূপভাবে বৈশ্য, শূদ্র জন্মগত অধিকারে পরিচিত হয়। এর ফলে দেখা গেল একই পরিবারের চার সন্তান চার রকম গুণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। কিন্তু জন্মগত কর্মবিভাজনে তাদের চারজনকে একই কর্ম করতে হচ্ছে। ফলে কর্মের দক্ষতা এরা দেখাতে পারছে না। তাই হিন্দুধর্মের বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেছেন সমাজে বর্ণবিন্যাস হয়েছে কর্মের যোগ্যতা অনুসারে। বর্ণভেদ পেশাগত ; অবশ্যই বংশানুক্রমিক নয়। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে বর্ণিত হয়েছে, একজন ঋষি বলেছেন, আমি বেদমন্ত্র দৃষ্টা ঋষি, আমার কন্যা যব ভেজে ছাতু বানিয়ে বিক্রি করে এবং আমার ছেলে চিকিৎসক। এ থেকে বোঝা যায়, বর্ণভেদ বংশানুক্রমিক ছিল না। তা ছাড়া সাধনার গুণে ক্ষত্রিয় রাজপুত্র বিশ্রামিত তপস্যার বলে ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করেছিলেন। বৈশ্য থেকে ব্রাহ্মণ হওয়ার দৃষ্টান্তও ধর্মগ্রন্থে রয়েছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে তিনি চার বর্ণের সৃষ্টি করেছেন। (গীতা, ৪/১৩)। কিন্তু একালেও বংশের ভিত্তিতে বর্ণ নির্ধারিত হচ্ছে। এ-বংশানুক্রমিক বর্ণভেদ প্রথা হিন্দুধর্মাবলম্বী একত্বের জন্য প্রতিবন্ধক এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের প্রতিকূল। সমাজ পরিবর্তনশীলতায় এ-প্রথার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। অনেক ক্ষেত্রেই সমাজের সচেতন পরিবারগুলো এ-প্রথার গোঁড়ামির প্রতিকূলে অবস্থান নিয়ে পারিবারিক কাজ সম্পাদন করছেন। পেশাগত বর্ণভেদের মূল লক্ষ্য ছিল পেশার উৎকর্ষসাধন ও নৈতিক গুণাবলির বিকাশের মাধ্যমে সামাজিক মজলসাধন করা। বংশানুক্রমিক বর্ণভেদ সমাজের সচেতন মানুষের নিকট কুসংস্কার ব্যতীত অন্যকিছু নয়। তাই এ-দৃষ্টিভঙ্গির আরও পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়।

একক কাজ : ‘হিন্দুধর্মে বর্ণভেদ প্রথা ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের প্রতিকূল’ – এ-সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

নতুন শব্দ : বর্ণভেদ, কুশলী, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র।

পাঠ ৩ : আশ্রমধর্ম

আশ্রমধর্ম হিন্দুসমাজে একটি বিশেষ দিক। প্রাচীনকালে ঋষিগণ মানবজীবনকে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করে দেখেছেন, যেমন- ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। এই চারটিকে একত্রে বলা হয় চতুরাশ্রম। মানুষের আয়ুষ্কাল মোটামুটি একশো বছর ধরা হয়। আর এই একশো বছরকে পঁচিশ বছর করে সমান চার ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম পঁচিশ বছরকে বলা হয় ব্রহ্মচর্য আশ্রম। এ-সময়ে গুরুগৃহ থেকে বিদ্যা অর্জন করার বিধান। দ্বিতীয় পর্যায় পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত গার্হস্থ্য জীবন। এ-সময়ে ব্রহ্মচারী গুরুগৃহ থেকে নিজ গৃহে ফিরে বিবাহ সম্পন্ন করে সংসারধর্ম পালন করে। পঞ্চাশ বৎসর অতিক্রম হলে সংসার ত্যাগ করে ধর্মানুশীলনের জন্য বনে যাওয়ার কথা। এটি চলবে পঁচাত্তর বছর পর্যন্ত। এ-পর্যায়কে বলা হয় বানপ্রস্থ। শেষ পঁচিশ বছরে আসে সন্ন্যাসধর্মের কথা। তখন মানুষ ধর্মানুশীলনে আত্মনিয়োগ করে। উক্ত এই চারটি স্তরে নির্ধারিত কর্মই হচ্ছে আশ্রমধর্ম।

নতুন শব্দ : ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস, চতুরাশ্রম, আয়ুষ্কাল।

পাঠ ৪ : যুগধর্ম

হিন্দুধর্মের মতে যুগ হচ্ছে চারটি- সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। মানবসভ্যতা বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়কে ধরা হয় সত্য যুগ। এ-যুগে মানুষ ছিল ধর্মপ্রাণ। তাদের জীবন ছিল সৎকর্মময়। তখন ধর্ম ছিল পূর্ণ, শোল আনা। এর পরে আসে ত্রেতা যুগ। এ-সময়ে মানুষের জীবনচর্য কিছু কিছু অসত্য এবং পাপের প্রকাশ ঘটে। তখন সমাজে হয় এক ভাগ পাপ আর তিন ভাগ ধর্ম। সমাজে ধর্ম নৈতিকতার প্রভাব তখনও বেশি থাকায় অধর্ম দুর্বল হয়ে থাকে।

পরবর্তী যুগকে বলা হয় দ্বাপর যুগ। এ-সময়ে ধর্মের প্রভাব আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। অপরদিকে পাপ, অন্যায়, অত্যাচার বেড়ে যায়। এখানে এসে ধর্ম ও অধর্ম সমান সমান হয়ে যায়। এ-সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়ে সমাজে দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ সাধন ও সৎ ব্যক্তিদের দুঃখমোচন আর ধর্ম সংস্থাপন করে গেছেন।

এরপর আসে কলিযুগ। এ-সময়ে ধর্মের অবস্থা আরও দুর্বল হয়। অপরদিকে অধর্ম তথা পাপকর্মের বৃদ্ধি ঘটে। মানুষের ধর্মবোধ হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। এ-অবস্থায় অবতার রূপে আসেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। তাঁর প্রচেষ্টায় সমাজে প্রেমভক্তি প্রবাহ সৃষ্টি হয়। সমাজজীবনে স্বস্তি ফিরে আসে।

চার যুগের আচরণের জন্য শাস্ত্রে ধর্ম-কর্মের নির্দেশ রয়েছে। তাকে বলা হয় যুগধর্ম।

তপঃ পরং সত্যযুগে ত্রেতায়াজ্ঞানমুচ্যতে।

দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহু দানমেকং কলৌ যুগে ॥

অর্থাৎ, সত্যযুগে তপস্যাই ছিল প্রধান ধর্ম; ত্রেতা যুগে জ্ঞান প্রধান ধর্ম, দ্বাপরে যজ্ঞ প্রধান ছিল আর কলি যুগে দানই প্রধান ধর্ম।

একক কাজ : যুগধর্ম অনুযায়ী চার যুগের বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ।

নতুন শব্দ : সৎকর্মময়, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, ত্রেতা, দ্বাপর।

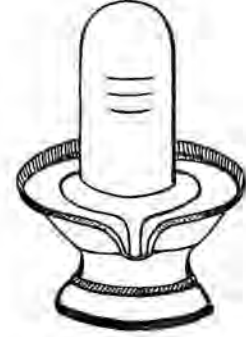
পাঠ ৫ : ব্রত ও ব্রত পালনে করণীয়

হিন্দুদের ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে পূজা, উপাসনা, পার্বণ ও ব্রতপালনের বিধান রয়েছে। পুণ্য অর্জন ও পাপ হতে মুক্তির ইচ্ছায় অনুষ্ঠিত ধর্মকর্মকেই ব্রত বলে। অর্থাৎ ব্রতপালনের উদ্দেশ্য হলো কোনো আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য বিশেষ কিছু আচার-বিধি পালন। হিন্দুধর্মাবলম্বীরা বিপত্তারিণী ব্রত, জামাইঘণ্টা ব্রত, জন্মাষ্টমী ব্রত, শিবরাত্রি ব্রত ইত্যাদি অনেক ব্রত পালন করে থাকেন।

ব্রতপালনের কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে। ব্রতের আগের দিন সংযম পালন করতে হয় এবং ব্রতের দিন ব্রত শেষ হওয়া পর্যন্ত উপবাস অবশ্য করণীয়। যে-দিনে বা তিথিতে যে-ব্রত উদ্ঘাটন করা হয় সে-দিনে বা তিথিতে ভক্তগণ উপবাস থেকে নির্দিষ্ট দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে পূজা নিবেদন করে থাকেন। প্রতিটি ব্রতের ব্রতকথা আছে। ব্রতপালনের সময় সুনির্দিষ্ট ব্রতকথা বলা বা পাঠ করা হয়। ভক্তগণ ভক্তিসহকারে সে ব্রতকথা শোনেন।

শিবরাত্রি

ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণ চতুর্দশী তিথির রাত্রিতে শিবের আরাধনা করা হয়। এটি শিবরাত্রি ব্রত হিসেবে পরিচিত। শিব মজ্জলময়। তিনি জগতের অকল্যাণ, অসুন্দর, অন্যায় দূর করে থাকেন। শিবশক্তি কল্যাণকর শক্তি। তাঁর অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য যে ব্রতপালন করা হয় সেটি শিবরাত্রি ব্রত হিসেবে খ্যাত। এই ব্রত সম্পর্কে কাহিনী শোনা যায়— এক সময় শিব-পার্বতী একত্রে অবস্থান করছেন। পার্বতী শিবকে প্রশ্ন করছেন, তিনি কিসে তুষ্ট হন? শিব উত্তরে বলেন, ‘যে ব্যক্তি উপবাসী হয়ে ভক্তি ভরে একটিমাত্র বিলুপত্র দিয়েও আমার অর্চনা করেন আমি তাতেই তুষ্ট হই। বহু উপচারে আমার অর্চনা করার প্রয়োজন হয় না। হে দেবী, এই হলো আমার প্রীতিকর ব্রত। এই ব্রতের ফলস্বরূপ ভক্ত তাঁর বাসনার বস্তু পেয়ে থাকেন। আমার অনুগ্রহ তাঁর প্রতি সর্বক্ষণ বর্ষিত হয়।’



শিব বলেন, তিনি ভক্তের ভক্তি দেখেন, আর তাঁর শ্রদ্ধাসহ বিলুপত্রের অঞ্জলিতে তুষ্ট হন। শিবরাত্রি ব্রত পালনের কিছু নিয়ম রয়েছে। যেমন— শিবরাত্রির আগের দিন থেকেই ভক্ত সংযম অবলম্বন করবেন। বাক্য, কর্মে, চিন্তায় দেহ-মনকে পবিত্র রাখবেন। উপবাস থেকে সারাদিন প্রয়োজনীয় কাজের মধ্যেও শিবকে স্মরণ করবেন। শিবরাত্রির আনুষ্ঠানিক কর্মের মধ্যে থাকবে—রাত্রির চার প্রহরে শিবকে চারবার অর্চনা করা। প্রথম প্রহরে শিবকে স্নান করাতে হয় দুগ্ধ দিয়ে। দ্বিতীয় প্রহরে দধি দিয়ে। তৃতীয় প্রহরে ঘৃত দিয়ে এবং চতুর্থ প্রহরে মধু দিয়ে। প্রতিবার স্নানের শেষে পূজা ধ্যান করতে হবে। এভাবে সারারাত্রি শিবের পূজায় কাটবে। পরের দিন ভক্ত শিবকে পূজা দিয়ে উপবাস ভেঙে পারণ করবে।

দলীয় কাজ : ব্রত পালনের উদ্দেশ্যসমূহ দলে আলোচনা করে খাতায় লেখ।

নতুন শব্দ : ব্রত, বিলুপত্র, অঞ্জলি।

পাঠ ৬ : শিবরাত্রির কথকা

শিবরাত্রির একটি ব্রত কথা আছে। এখন শিবরাত্রির ব্রতকথাটি শোনা যাক -

‘শিবরহস্য’ নামক ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, পুরাকালে বারাণসী নগরে এক ব্যাধ বাস করতেন। খর্ব দেহ, কৃষ্ণকায়, পিঙ্গল চোখ, পিঙ্গল চুল। দেখতে ভয়ংকর ছিলেন সেই ব্যাধ। আবার তাঁর সঙ্গে থাকত পশুপাখি ধরার জাল, অস্ত্র শস্ত্র ইত্যাদি। বনের পশুপাখি শিকার করে তাদের মাংস বিক্রি করাই ছিল তাঁর পেশা। এখন একদিন তিনি বনে গিয়ে প্রচুর পশু শিকার করলেন। তারপর মাংসের ভার বহন করে বাড়ির দিকে রওনা করলেন। বোঝা খুব ভারী ছিল। চলেও গিয়েছিলেন গভীর বনে। ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে তিনি বিশ্রামের জন্য একটি গাছের গোড়ায় শুয়ে পড়লেন। দারুণ ক্লান্তিতে তিনি অতি দ্রুত ঘুমিয়ে পড়লেন। সূর্য অস্ত গেল। রাত নামল। চতুর্দশী তিথির অন্ধকার রাত। গভীর অন্ধকারে তিনি কী করে বাড়ি ফিরবেন! অন্ধকারে বন্যপশুরা যদি আক্রমণ করে! তিনি তখন যে-গাছের নিচে শুয়েছিলেন তার ডালের সাথে শিকার-করা পশুর মাংসের বোঝা ঝুলিয়ে রাখলেন। তারপর নিজেও চড়ে বসলেন ঐ গাছের ডালে। গাছটি ছিল বেলগাছ। গভীর রাতে শীতল ও ক্ষুধার্ত ব্যাধের শরীর কাঁপতে লাগল। তার উপর শিশির পড়ছিল। ঠাণ্ডা শিশিরে ব্যাধের কাঁপুনি গেল বেড়ে।

ঘটনাচক্রে সেই বেলগাছের গোড়ায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন শিবের প্রতীক শিবলিঙ্গ। শিবচতুর্দশীর রাত্রিতে শিবের পূজা করতে হয়। শিবকে বেলপাতা দিয়ে, জল দিয়ে পূজা করতে হয়। ব্যাধ শীতে কাঁপছিলেন এবং সঙ্গেগে গাছের ডাল চেপে ধরছিলেন। তাতে করে শিশিরভেজা বেলপাতা আপনা থেকেই ছিন্ন হয়ে শিবলিঙ্গের উপর পড়ল। এভাবেই তো ভক্তেরা জল ও বেলপাতা দিয়ে শিবচতুর্দশীর রাত্রিতে শিবের পূজা করে থাকেন। ঐ ব্যাধও জল (শিশির) ও বেলপাতা দিয়ে নিজের অজ্ঞাতেই শিবের পূজা করে ফেলেন। তিথিমাহাত্ম্যে ব্যাধও শিবপূজার পুণ্যফল অর্জন করলেন। কিন্তু ব্যাধ নিজেও তা জানতে পারলেন না।

ব্যাধ যখন মারা গেলেন তখন যমদূতেরা চলে এলেন তাঁর আত্মাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কারণ তিনি জীবনে যে-পাপ করেছিলেন তার জন্য তাঁকে নরকবাস করতে হবে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ চলে এলেন শিবদূতেরা। শিবদূতেরা তাঁকে শিবধামে নিয়ে যাবেন। তখন শিবদূত ও যমদূতদের মধ্যে বাগড়া লেগে গেল। পাপের ফলে যার যমালয়ে যাওয়ার কথা তাঁকে শিবদূতেরা শিবধামে নিয়ে যেতে চান! কিন্তু শিবদূতদের জন্য যমদূতেরা ব্যাধের কাছে ঘেঁষতে পারছেন না। তখন তাঁরা যমরাজের কাছে গিয়ে ঘটনাটা জানালেন। যমরাজ তখন শিবধামে গিয়ে শিবের সেবক নন্দীর কাছে জানতে চাইলেন, একজন ঘোর পাপীকে কেন যমালয়ের পরিবর্তে শিবধামে নেওয়ার জন্য শিবদূতেরা গিয়েছেন। ঐ ব্যাধ কী এমন পুণ্য করেছেন, যার জন্য বহুপুণ্যের ফলে যে-শিবধাম পাওয়া যায় সেই শিবধামে যাওয়ার যোগ্য হলেন?

তখন নন্দী যমরাজকে এক শিবচতুর্দশী তিথির রাত্রে নিজের অজ্ঞাতে জল ও বেলপাতা দিয়ে শিবের পূজা করার কথা জানালেন, ‘পাপীও যদি শিবরাত্রিতে যথাবিধি শিবের পূজা করে, তাহলে তার সমস্ত পাপের বিনাশ ঘটে এবং সে পুণ্যবান হয়ে শিবধাম প্রাপ্ত হয়। এভাবেই ঐ ব্যাধের সকল পাপের বিনাশ ঘটেছে এবং সে পুণ্যবান হয়ে শিবধাম প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জন করেছে।’

শিবচতুর্দশীতে শিবরাত্রি ব্রতের মাহাত্ম্যের কথা শুনে যমরাজ বিস্মিত হলেন। এভাবেই শিবরাত্রি ব্রতের মাহাত্ম্যের কথা কৈলাশে, দেবলোকে ও পৃথিবীতে প্রচারিত হলো। তখন থেকে শিবভক্তেরা প্রতি বছর শিবরাত্রি ব্রত করে আসছেন।

নতুন শব্দ : শিবচতুর্দশী, শ্রান্ত, ব্যাধ, পিঙ্গল।

পাঠ ৭ : ব্রতপালনের গুরুত্ব

হিন্দুধর্মের একটি বিশ্বাস এই যে, ব্রত পালন করলে উদ্ভিষ্ট দেবতা ব্রতীর আকাজক্ষা পূরণ করবেন। ব্রতের মাধ্যমে আমার আকাজক্ষা পূরণ হবে— এ-আত্মবিশ্বাসের জাগরণ এবং সেই আকাজক্ষা পূরণের জন্য ব্রতীর ক্রিয়াশীল হওয়া ব্রতপালনের একটি বিশেষ প্রাপ্তি।

ব্রতে আলপনা কেটেও আকাজক্ষার প্রকাশ ঘটানো হয়। যেমন— ধানের গোলা আঁকলে বাস্তব প্রকৃত ধানের গোলা হবে। স্বেচ্ছা ব্রতের একটি মন্ত্র হচ্ছে :

আমি দিই পিটুলির গোলা।

আমার হোক সত্যিকারের গোলা ॥

লক্ষ্মীদেবীর পায়ের চিহ্ন আঁকলে সেই চিহ্নে পা ফেলে ফেলে লক্ষ্মীদেবী নিজেই ঘরে আসবেন। ব্রতীকে ধনসম্পদ দান করবেন। ব্রতী সুখী হবেন।

অক্ষয় তৃতীয়ার ব্রতকথা আমাদের দানের প্রতি উৎসাহিত করে। অরণ্যযন্ত্রী ব্রত করলে সন্তানসন্ততি দীর্ঘায়ু ও ঐশ্বর্যশালী হয়। দুর্বারমী ব্রত করলে সাতপুরুষ সুখে থাকা যায় এবং দুর্বীর মতো সজীব ও আনন্দময় হয় বংশের সকলের জীবন।

এভাবে ব্রতপালনের মধ্য দিয়ে ব্রতীর আকাজক্ষা পূরণ হয়। ব্রতকে কেন্দ্র করে উপবাসের মধ্য দিয়ে দেহ ও মন সংযত হয়। শরীর ও মন দুইই ভালো থাকে।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. হিন্দুধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ।
২. হিন্দুধর্মের বর্ণপ্রথা নয়।
৩. আমাদের জীবনে কে ধরে রাখতে হবে।
৪. জটিল পরিস্থিতিতে নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে হয়।
৫. রাজপুত্র বিশ্বামিত্র বলে ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করেছিল।

ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর :

| বাম পাশ | ডান পাশ |
|--|-------------------|
| ১. বহু সাধকের সাধনায় ফসল নিয়ে | ধর্ম |
| ২. সৃষ্টিকে বিশেষভাবে ধারণ করে রয়েছে | বিকশিত হচ্ছে ধর্ম |
| ৩. বেদ, স্মৃতিশাস্ত্র , সদাচার ও বিবেকের বাণী এই চারটি | বেদ |
| ৪. হিন্দুধর্মের আদি ধর্মগ্রন্থ | প্রাণী |
| ৫. মানুষ বিবেকবান | ধর্মের লক্ষণ |
| | মহাভারত |

নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১. সদাচারের ধারণা উদাহরণ সহকারে ব্যাখ্যা কর ।
২. যজ্ঞকর্মের প্রতি মানুষের আগ্রহ কমে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর ।
৩. কর্মযোগ বলতে কী বোঝায় ?
৪. ধর্মাচরণের মূল লক্ষ্য ব্যাখ্যা কর ।

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. হিন্দুধর্মের সাধারণ লক্ষণগুলো মেনে চলার কারণ ব্যাখ্যা কর ।
২. হিন্দুধর্মের বিশেষ লক্ষণগুলো বিশ্লেষণ কর ।
৩. বর্ণপ্রথার গৌড়ামির দিকটি বিশ্লেষণ কর ।
৪. হিন্দুধর্ম বিকাশের পরিচয় দাও ।
৫. শিবরাত্রি পালনের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. 'ধর্ম' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে কোন ধাতু থেকে ?

ক. ধৃ

খ. গম্

গ. বদ্

ঘ. দৃশ্

২. ধর্মের সাধারণ লক্ষণ কয়টি?

ক. চার

খ. পাঁচ

গ. আট

ঘ. দশ

৩. মানুষের ধর্ম হচ্ছে—

- i. মানবতা
- ii. মমতা
- iii. মনুষ্যত্ব

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i
- খ. i ও ii
- গ. ii ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

সন্তোষবাবু শিক্ষকতা করেন। তিনি নিজে পড়েন, শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সহকারে পড়ান। ছাত্রছাত্রীদের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। শিক্ষকতার আনন্দসহ পরিবারের সবাইকে নিয়ে তিনি সুখে আছেন।

হিন্দুধর্ম অনুসারে সন্তোষবাবু কোন বর্ণের অন্তর্ভুক্ত?

- ক. ব্রাহ্মণ
- খ. ক্ষত্রিয়
- গ. বৈশ্য
- ঘ. শূদ্র

সন্তোষবাবুকে উক্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করার কারণ —

- i. কর্ম
- ii. জন্ম
- iii. দক্ষতা

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i
- খ. i ও iii
- গ. ii ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

কালু চৌর্যবৃত্তির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। এই কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য অনেকেই তাকে বোঝালে কালু এই কাজ ছাড়তে পারে না। একদিন সে চুরি করতে গিয়ে নদীতে পড়ে হাবুডুবু খেতে থাকে। সজল নদীর পাড় দিয়ে যাওয়ার সময় কালুকে দেখতে পায়। কালুর কাজকর্ম সম্পর্কে তার জানা থাকলেও সে কালুকে নদী থেকে টেনে তোলে।

- ক. মহাভারতের কোন পর্বে ধর্মের লক্ষণের কথা বলা হয়েছে ?
- খ. বেদকে সনাতন ধর্মের মূল ভিত্তি বলার কারণ ব্যাখ্যা কর ?
- গ. সজলের আচরণের মাধ্যমে ধর্মের যে বিশেষ লক্ষণটি প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ধর্মের সাধারণ লক্ষণ অনুযায়ী কালুর চরিত্র বিশ্লেষণ কর।

চতুর্থ অধ্যায়

নিত্যকর্ম ও যোগাসন

নিত্যকর্ম ও যোগাসন

নিত্যকর্মগুলো হলো পরম পবিত্র কর্ম। নিত্যকর্ম অনুশীলন করলে যোগ, তপ, সাধনা, কাজকর্ম, উপভোগ, আনন্দ, স্মৃতি সমস্ত কর্মই ভালো লাগে এবং জাগতিক ও পারমার্থিক মঙ্গল লাভ হয়। শরীরই ধর্মকর্মের মূল আধার। সুতরাং দেহকে নীরোগ ও মন শান্ত রাখার জন্য সকলেরই যোগাসন অনুশীলন করা অবশ্যকর্তব্য।



গোমুখাসন, ভুজঙ্গাসন, বজ্রাসন, নিয়মিত অনুশীলনে বহুমুখী সুফল লাভ করা যায়। এই অধ্যায়ে নিত্যকর্ম অনুশীলনের প্রভাব ও যোগাসন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

এ-অধ্যায়শেষে আমরা-

- ☐ নিত্যকর্ম অনুশীলনের প্রভাব বর্ণনা করতে পারব
- ☐ গোমুখাসনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- ☐ গোমুখাসন অনুশীলন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব

- গোমুখাসন অনুশীলন ও এর প্রভাব বর্ণনা করতে পারব
- ভুজঙ্গাসনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- ভুজঙ্গাসন অনুশীলন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব
- ভুজঙ্গাসন অনুশীলন ও এর প্রভাব বর্ণনা করতে পারব
- বজ্রাসনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- বজ্রাসন অনুশীলনপদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব
- বজ্রাসন অনুশীলন ও এর প্রভাব বর্ণনা করতে পারব।

পাঠ ১ : নিত্যকর্ম অনুশীলনের প্রভাব

নিত্যনৈমিত্তিক সদাচারই মনুষ্যজীবনের অমূল্য সম্পদ। যারা নিত্যকর্ম অনুশীলন করে তাদের মন ধীর, স্থির ও শান্ত থাকে, শরীর ভালো ও কর্মঠ থাকে এবং তাদের জীবন শুদ্ধ, পবিত্র ও নির্মল হয়। মানুষ যখন নতুন গৃহস্থ কর্ম আরম্ভ করে তখন তাদের কিছুই থাকে না। দুই-চার বছর পরে যদি তারা ঘর পরিত্যাগ করে তখন তাদের এত জিনিসপত্র হয়ে যায় যা নিতে ট্রাক বা গাড়ির প্রয়োজন হয়। সেরকম মানুষ যদি প্রতিদিন নিত্যকর্মে ব্যস্ত থেকে অন্যকর্ম করে তাদের নিত্যকর্ম-সম্বন্ধীয় বিশাল জ্ঞান লাভ হয়। যারা কিছুই করে না তাদের সামনে সবকিছুই বোঝা মনে হয় এবং নিজস্ব কর্মেও আলস্য, কুসংকে আর লেগেই থাকে। তারা শুভকর্ম এবং মজ্জলচিত্তা করতে সময়ই পায় না।



নিত্যকর্মের দ্বারা শুভকর্মের ফল সর্বদাই প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রত্যেকের শুভকর্ম করার জন্য একটা সময় নির্ধারণ হয়ে যায়। দৈনিক নিত্যকর্মকর্তীদের ঘরও পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, শুদ্ধ, পবিত্র থাকে। বিছানায় ঘুম ভাঙতেই ব্রহ্মমূহূর্তে অমৃত বেলায় শুভ সংকল্প করে মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে শ্রদ্ধা ভক্তিতে ঈশ্বরকে ডাকলে আলস্য দূর হয়ে যায় এবং সমস্ত দিন সুন্দরভাবে কাটতে থাকে। প্রাতঃকালের আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ অনুষ্ঠানের ফল দিনের যে-কোনো সময়ে অনুষ্ঠিত

পারমার্থিক কার্যকলাপের ফল থেকে অনেক বেশি। প্রতিদিন গুরুজনকে নমস্কার করলে তাঁদের প্রতি কখনও খারাপ ব্যবহার, অসম্মান, অমর্যাদা করার সাহস হয় না। নমস্কার বিনম্রতার প্রতীক। সেজন্য পিতামাতা, বিদ্বান, বয়োবৃদ্ধ, গুরুজনদের প্রতি নিত্য নমস্কার করা উচিত যাতে অশ্রদ্ধা সেখানে বিনম্রতা হয় এবং বিরুদ্ধ আচরণ না হয়।



প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা যোগব্যায়াম শরীরকে কেন্দ্র করেই হয়। ‘শরীরং আদ্যং খলু ধর্ম সাধনম্’— শরীরই ধর্মকর্মের মূল आधार। সুতরাং যোগাসন প্রতিদিন নিয়মিত করলে শরীর হুঁটপুঁট, বলবান, শক্তিশালী, ওজস্বী, তেজস্বী থাকে এবং উত্তম ভাবনায় আগ্রহমূলক কর্মের প্রচেষ্টা হয়। মানুষমাত্রই শান্তির জন্য ঈশ্বরের উপাসনা করে। প্রতিদিন পূজা-অর্চনা, উপাসনাদি দ্বারা ভগবানের নাম উচ্চারণের ফলে এবং তাঁর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানানোর ফলে আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত হয় এবং ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। নিষ্কর্মাদের কোনো কর্মই মন লাগে না। যা কিছু করে বাধ্যতামূলক, ইচ্ছা না থাকলেও করে। তারা জীবনে উন্নতি করতে পারে না।

সুতরাং নিত্যকর্মগুলো হলো পরম পবিত্র কর্ম। নিত্যকর্ম অনুশীলন করলে যোগ, তপ, সাধনা, কাজ, কর্ম, উপভোগ, আনন্দ, স্মৃতি সমস্ত কর্মই ভালো লাগে এবং জাগতিক ও পারমার্থিক মজল লাভ হয়।

আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত দৈনিক নিত্যকর্মাদি করা এবং অত্যাবশ্যক ধর্ম, কর্মদি, মন্ত্রার্থ, মননের সঙ্গে আচরণ করা।

নতুন শব্দ : সদাচার, গৃহস্থকর্ম, ব্রহ্মমূর্ত্ত, অমৃত বেলা, আধ্যাত্মিক, পারমার্থিক, ওজস্বী, তেজস্বী, তপ, নিষ্কর্মা, জাগতিক।

পাঠ - ২, ৩ ও ৪ : গোমুখনের ধারণা, অনুশীলন পদ্ধতি ও প্রভাব

গোমুখাসনের ধারণা :

এই আসনে অবস্থানকালে আসন অভ্যাসকারীর পায়ের অবস্থান গরুর মুখের মতো হয়, তাই এই আসনের নাম গোমুখাসন।

অনুশীলন পদ্ধতি

দুই সামনের দিকে লম্বা করে ছড়িয়ে সোজা হয়ে বসতে হবে। তারপর ডান পা হাঁটুতে ভেঙে বাঁ পায়ের হাঁটুর উপর দিয়ে নিয়ে গিয়ে ডান পায়ের গোড়ালি বাঁ নিতম্বে স্পর্শ করাতে হবে। বাঁ পা হাঁটুতে ভেঙে বাঁ পায়ের গোড়ালি ডান নিতম্বের পাশে স্পর্শ করাতে হবে। এবার ডান হাত মাথার উপর তুলে কনুইতে ভেঙে ডান হাতের পাতা ঘাড় বরাবর পিঠের উপর নামবে। বাঁ হাত কনুইতে ভেঙে পিছনে পিঠের উপর দিকে নিতে হবে। দুহাতের আঙুলগুলো বড়শির মতো করে এক হাত আর এক হাতের সঙ্গে আটকে দিতে হবে। ঘাড় আর মেবুদড় সোজা থাকবে। দৃষ্টি থাকবে সামনের দিকে। শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে এভাবে ৩০ সেকেন্ড থাকতে হবে। তারপর হাত দুটো ছেড়ে, পা দুটো আগের মতো লম্বা করে সামনের দিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। এরপর ডানের জায়গায় বাঁ আর বাঁয়ের জায়গায় ডান ধরে অর্থাৎ হাত-পা বদল করে আসনটি আবার করতে হবে। এরপর ৩০ সেকেন্ড শ্বাসনে বিশ্রাম নিতে হবে। এরকম চারবার করতে হবে। মনে রাখতে হবে, ডান হাঁটু যখন বাঁ হাঁটুর উপর থাকবে তখন ডান হাত উপরে উঠবে আর বাঁ হাঁটু যখন ডান হাঁটুর উপর থাকবে তখন বাঁ হাত উপরে উঠবে।



একক কাজ : গোমুখাসনটি অনুশীলন করে দেখাও।

প্রভাব

গোমুখাসন নিয়মিত অনুশীলন করলে—

১. পায়ের পেশি নমনীয় হয়, পায়ের ব্যথা দূর হয়।
২. হাঁটুর বাত নিরাময় হয়।
৩. পিঠের মাংসপেশির ব্যথা দূর হয়।
৪. অসমান কাঁধ সমান হয়।
৫. কাঁধের সন্ধিস্থলে ব্যথা দূর হয়।

৬. মেরুদণ্ড নমনীয় হয়, বাঁকা মেরুদণ্ড সোজা হয়।
৭. পরিপাক যন্ত্রের গোলযোগ ও কোষ্ঠাবদ্ধতা দূর হয়।
৮. হৃদয় শক্তি বৃদ্ধি পায়।
৯. অনিদ্রা দূর হয়।
১০. মনের অস্থিরতা ও চঞ্চলতা দূর হয়, মন শান্ত থাকে।

দলীয় কাজ : গোমুখাসন অনুশীলনের উপকারিতা লিখে একটি পোস্টার তৈরি কর।

নতুন শব্দ : গোমুখাসন, গোড়ালি, নিত্য, বাত, পেশি, পরিপাক যন্ত্র, নিরাময়, কোষ্ঠাবদ্ধতা, নমনীয়, সন্ধিস্থল।

পাঠ - ৫, ৬ ও ৭ : ভুজঙ্গাসনের ধারণা, অনুশীলন পদ্ধতি ও প্রভাব

ভুজঙ্গাসনের ধারণা :

‘ভুজঙ্গ’ শব্দের অর্থ সাপ। এই আসনে অবস্থানকালে কোমর থেকে দেহের উপরের অংশকে উপরে তুলতে হয়। এই সময় এই আসন অভ্যাসকারীকে ভুজঙ্গ অর্থাৎ সাপ ফণা তুললে যেমন দেখতে হয়, সেরকম হয়। তাই এই আসনের নাম ভুজঙ্গাসন। একে সর্পাসনও বলা হয়।



অনুশীলন পদ্ধতি :

শরীরের সমস্ত মাংসপেশিকে শিথিল করে পা দুটো জোড়া ও লম্বা করে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে হবে। পায়ের আঙুলগুলো মাটির সাথে লেগে থাকবে। হাঁটু, উরু ও গোড়ালি সোজা থাকবে। দুহাত কনুইয়ের কাছ থেকে ভেঙে দু হাতের তালু উপুড় করে পাঁজরের কাছে দুপাশে মাটিতে রাখতে হবে। এরপর হাতের উপর অঙ্গ ভর দিয়ে চিবুক উপরে তুলে ঘাড় পিছন দিকে নিতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পা থেকে নাভি পর্যন্ত শরীরের নিচের অংশ ভূমিসংলগ্ন রেখে দেহের উপরের অংশ হাতের উপর বেশি জোর না দিয়ে শুধু বুক ও কোমরের উপর জোর দিয়ে উপরে তুলতে হবে। এ-অবস্থায় সমস্ত শরীর শিথিল করে ৩০ সেকেন্ড থাকতে হবে। এরপর আস্তে আস্তে পেট, বুক, ঘাড় ও চিবুক নামিয়ে ভূমিসংলগ্ন করতে হবে এবং ৩০ সেকেন্ড চিৎ হয়ে শবাসনে বিশ্রাম নিতে হবে। এইভাবে এই আসন ও শবাসন চারবার অভ্যাস করতে হবে। এই আসন অভ্যাসকালে শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে।

একক কাজ : ভুজঙ্গাসনটি অনুশীলন করে দেখাও।

প্রভাব :

ভুজঙ্গাসন নিয়মিত অনুশীলন করলে—

১. মেরুদণ্ড নমনীয় হয়।
২. বাঁকা মেরুদণ্ড সোজা ও সরল হয়।
৩. মেরুদণ্ডের বাত সারে।
৪. পিঠের ও কোমরের পেশি মজবুত হয়, কোমরে ব্যথা হতে পারে না।
৫. স্নায়ুমণ্ডলী সতেজ হয়।
৬. শরীরের নিম্নে জ্ঞান দূর হয় ও নতুন শক্তি জন্মায়।
৭. হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস সবল হয়।
৮. বুকের গঠন সুন্দর হয় এবং দেহের লাভণ্য বৃদ্ধি পায়।
৯. যকৃৎ ও প্লীহার কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, হজমশক্তি বাড়ে।
১০. অজীর্ণ, অম্বল, অক্ষুধা, গ্যাস্ট্রিক, উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদি রোগে সুফল পাওয়া যায়।
১১. যারা কোলকুঁজে তাদের বিশেষ উপকার হয়।

দলীয় কাজ : ভুজঙ্গাসন অনুশীলনে কী উপকার হয়, তার একটি তালিকা তৈরি কর।

নতুন শব্দ : ভুজঙ্গা, চিবুক, পাজর, সৎলগ্ন, নিম্নে জ, লাভণ্য, কোলকুঁজে, যকৃৎ, প্লীহা, অজীর্ণ, অম্বল।

পাঠ-৮, ৯ ও ১০ : বজ্রাসনের ধারণা, অনুশীলন পদ্ধতি ও প্রভাব**বজ্রাসনের ধারণা :**

যোগশাস্ত্র মতে আসনটি অভ্যাসে দেহের নিম্নভাগের স্নায়ু ও পেশি বজ্রের মতো কঠিন, মজবুত ও সুদৃঢ় হয়। তাই আসনটির নাম বজ্রাসন। এটি খাওয়ার পরে করা একমাত্র আসন।



অনুশীলন পদ্ধতি :

হাঁটু ভেঙে পা দুটো পিছন থেকে মুড়ে নিতম্বের নিচে এমনভাবে রাখতে হবে, যাতে গোড়ালি দুটো বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকে এবং পায়ের পাতা নিতম্বের সঙ্গে লেগে থাকে। এই অবস্থায় দুপায়ের বুড়ো আঙুল পরস্পরের সঙ্গে লেগে থাকবে কোমর, গ্রীবা এবং মাথা সোজা হয়ে থাকবে। দুই হাঁটু পরস্পরের সঙ্গে লেগে থাকবে। হাতের কনুই না ভেঙে ডান হাত থাকবে ডান হাঁটুর উপর পাতা আর বাঁ হাত থাকবে বাঁ হাঁটুর উপর পাতা। শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে এভাবে ৩০ সেকেন্ড বসতে হবে। তারপর ৩০ সেকেন্ড শ্বাসনে বিশ্রাম নিতে হবে। এভাবে ৩/৪ বার অভ্যাস করতে হবে।

একক কাজ : বজ্রাসনটি অনুশীলন করে দেখাও।

প্রভাব :

বজ্রাসন নিয়মিত অনুশীলন করলে—

১. হাঁটুর ও গোড়ালির গাঁটের বাতজনিত ব্যথা দূর হয়, সায়টিকা সারে।
২. পায়ের পেশি ও স্নায়ুজাল সতেজ ও সক্রিয় হয়।
৩. অন্ধুখা ও অনিদ্রা দূর হয়।
৪. মনের চঞ্চলতা দূর হয়।
৫. স্বাস্থ্য সুন্দর ও লাভগম্য হয়।
৬. পরিপূর্ণ আহারের পর এ আসনটি ৫ থেকে ১৫ মিনিট অভ্যাস করলে খাদ্যবস্তু সহজে হজম হয় এবং হজমশক্তি বৃদ্ধি পায়।
৭. বজ্রাসনে বসে চুল আঁচড়ালে সহজে চুল পাকে না বা পড়ে না।

দলীয় কাজ : বজ্রাসনের উপকারিতা লিখে একটি পোস্টার তৈরি কর।

নতুন শব্দ : বজ্রাসন, সুদৃঢ়, গ্রীবা, গাঁট, সায়টিকা, স্নায়ুজাল।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. নিত্য নৈমিত্তিক মনুষ্য জীবনের অমূল্য সম্পদ ।
২. নমস্কার প্রতীক ।
৩. সর্পাসন বলা হয় ।
৪. গোমুখাসনে ঘাড় আর মেরুদণ্ড থাকবে ।
৫. সহজে চুল পাকে না বসে চুল আঁচড়ালে ।

ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর :

| বাম পাশ | ডান পাশ |
|--|----------------------------|
| ১. নিত্যকর্মের দ্বারা শুভকর্মানুষ্ঠানিক ফল | গরুর মুখের মতো হয় |
| ২. হাঁটু, উরু ও গোড়ালি সোজা থাকে | মূল আধার |
| ৩. গোমুখাসনে অভ্যাসকারীর পায়ের অবস্থা | বজ্রাসনে |
| ৫. শরীরই ধর্মকর্মের | সর্বদাই প্রত্যক্ষ করা যায় |
| | ভুজঙ্গাসনে |

নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১. ‘নিত্যকর্ম অনুশীলনে জাগতিক ও পারমার্থিক মঙ্গল হয়’- কথাটি বুঝিয়ে লেখ ।
২. ভুজঙ্গাসন অনুশীলন পদ্ধতির ধাপসমূহ ধারাবাহিকভাবে লেখ ।
৩. ভুজঙ্গাসন অনুশীলনে মেরুদণ্ডের ওপর কী প্রভাব পড়ে ? ব্যাখ্যা কর ।
৪. গোমুখাসন অনুশীলনের উপকারিতা কী ?

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. কয়েকটি নিত্যকর্ম উল্লেখ করে এর অনুশীলনের প্রভাব বর্ণনা কর ।
২. গোমুখাসন অনুশীলন পদ্ধতি বর্ণনা কর ।
৩. ভুজঙ্গাসন কীভাবে অনুশীলন করতে হয় ?
৪. বজ্রাসন অনুশীলন পদ্ধতি বর্ণনা কর ।
৫. শরীর-মনে বজ্রাসন অনুশীলনের প্রভাব ব্যাখ্যা কর ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. কোন সময়ের আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ অনুষ্ঠানের ফল অনেক বেশি ?

- | | |
|--------------|--------------|
| ক. প্রাতঃকাল | খ. পূর্বাহ্ন |
| গ. মধ্যাহ্ন | ঘ. অপরাহ্ন |

২. যোগাসন অনুশীলনের পর বিশ্রাম নিতে হয় -

- | | |
|-------------|------------|
| ক. সুখাসনে | খ. শবাসনে |
| গ. ভদ্রাসনে | ঘ. বীরাসনে |

৩. গোমুখাসন নিয়মিত অনুশীলন করলে -

- হাঁটুর বাত নিরাময় হয়
- মেরুদণ্ড শক্ত হয়
- পরিপাকবন্ত্রের গোলযোগ দূর হয়

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী শ্রেয়সী লেখাপড়ার পাশাপাশি নিয়মিত যোগাসন অনুশীলন করে। সে উপুড় হয়ে শুয়ে হাঁটু, উরু ও গোড়ালি সোজা রেখে একটি আসন অনুশীলন করে এবং এর সুফলও উপলব্ধি করে।

৪. শ্রেয়সী কোন যোগাসনটি অনুশীলন করে ?

- | | |
|--------------|-------------|
| ক. বজ্রাসন | খ. শবাসন |
| গ. ভুজঙ্গাসন | ঘ. গোমুখাসন |

৫. শ্রেয়সীর উক্ত আসনটি নিয়মিত অনুশীলনের ফলে -

- দেহের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়
- হজমশক্তি বাড়ে
- হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস সবল থাকে

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. মিতা অফ্টম শ্রেণিতে পড়ে। সে লেখাপড়ায় ভালো। কিন্তু সে নিয়মিত স্কুলে আসে না। শ্রেণিশিক্ষক কারণ জানতে চাইলে মিতা জানায় তার মা প্রায়ই অসুস্থ থাকেন। তার মায়ের সমস্যা হলো কোনো খাবার খাওয়ার পর উদ্বেগ ও অস্বস্তি বোধ করেন এবং হজম করতে পারেন না। ঔষধ খাচ্ছেন কিন্তু সুফল পাচ্ছেন না। শিক্ষক সব শোনার পর মিতাকে তার মায়ের জন্য একটি যোগাসন অনুশীলন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দেন। শিক্ষকের কথামতো মিতার মা উক্ত আসন অনুশীলন করে শরীর ও মনে এই আসনের সুফল উপলব্ধি করেন।

ক. নমস্কার কিসের প্রতীক ?

খ. নিত্যকর্ম অনুশীলনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে শিক্ষক মিতাকে তার মায়ের সুস্থতার জন্য কোন যোগাসন অনুশীলন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দেন ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মিতার মায়ের শরীর ও মনের ওপর উক্ত আসন অনুশীলনের প্রভাব মূল্যায়ন কর।

২. সড়ক-দুর্ঘটনায় কোমর ও পিঠে ভীষণ আঘাত পেয়ে রতনবাবুর পঞ্জু হওয়ার উপক্রম হয়। চিকিৎসায় সুস্থ হলেও তাঁর মেরুদণ্ড বাঁকা হয়ে যায়। তিনি সোজা হয়ে হাঁটতে পারেন না এবং কোমরের ব্যথায় কষ্ট পান। আরোগ্যলাভের আশায় তিনি পক্ষাঘাত পুনর্বাসন কেন্দ্রে যান। চিকিৎসক তাঁকে প্রয়োজনীয় ফিজিও থেরাপি দিয়ে একটি আসন অনুশীলনের পদ্ধতি শিখিয়ে দেন। রতনবাবু চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী আসনটি নিয়মিত অনুশীলনে সুস্থ হন। তাঁর অনুভূতি শুধু শারীরিকভাবেই আরোগ্য নয় বরং মানসিকভাবেও তিনি এখন সুস্থ।

ক. দেহ ও মনকে নীরোগ ও শান্ত রাখার জন্য নিয়মিত কী করা প্রয়োজন ?

খ. নিত্যকর্মকে পবিত্র কর্ম বলা হয় কেন ? ব্যাখ্যা কর।

গ. রতনবাবু কোন আসন অনুশীলন করে আরোগ্য লাভ করেন ? উক্ত আসন অনুশীলন প্রক্রিয়াটি বর্ণনা কর।

ঘ. ‘রতনবাবু শুধু শারীরিকভাবেই আরোগ্য নন বরং মানসিকভাবেও তিনি এখন সুস্থ’ – উক্ত আসনের পরিপ্রেক্ষিতে বক্তব্যটি মূল্যায়ন কর।

পঞ্চম অধ্যায়

দেব-দেবী ও পূজা-পার্বণ

ঈশ্বর নিরাকার হলেও এ মহাবিশ্বের প্রয়োজনে বিভিন্ন রূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে থাকেন। ঈশ্বর যখন নিজের কোনো গুণ বা ক্ষমতাকে কোনো বিশেষ আকার বা রূপে প্রকাশ করেন, তখন তাঁকে দেবতা বা দেব-দেবী বলে। যেমন- ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি। ব্রহ্মা সৃষ্টির দেবতা, ভগবান বিষ্ণু প্রতিপালন ও রক্ষাকারী দেবতা, শিব ধ্বংসের দেবতা।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থ অনুসারে আমরা তিন প্রকার দেব-দেবীর পরিচয় পাই : বৈদিক দেবতা, পৌরাণিক দেবতা ও লৌকিক দেবতা।



বৈদিক দেবতা – যেসকল দেবতার নাম বেদে উল্লেখ আছে, তাঁদের বৈদিক দেবতা বলে।

পৌরাণিক দেবতা – যেসকল দেবতার নাম পুরাণে উল্লেখ আছে, তাঁদের পৌরাণিক দেবতা বলে।

লৌকিক দেবতা – বেদে বা পুরাণে উল্লেখ নেই, লৌকিকভাবে পূজিত হন এমন দেবতাদের বলা হয় লৌকিক দেবতা।

আমরা এসকল দেব-দেবীর পূজা করে থাকি। দেব-দেবীর পূজা করলে ঈশ্বর খুশি হন এবং ভক্তের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়।

‘পূজা’ ও ‘পার্বণ’ শব্দ দুটি সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু পূজা মানে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। দেব-দেবীকে পুষ্পপত্র, নৈবেদ্য ইত্যাদি দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করাকে পূজা বলে অভিহিত করা হয়। আর ‘পার্বণ’ শব্দের অর্থ হলো পর্ব বা উৎসব। উৎসব মানে আনন্দানুষ্ঠান। হিন্দুধর্মের বিধিবিধান অনুসারে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজায় বিভিন্ন ধরনের উৎসবের আয়োজন করা হয়। একেই বলে পার্বণ। পূজা উপলক্ষে নানারকমের আয়োজন করা হয়। পূজার জন্য নানারকম উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহার করা হয়। যেমন- প্রতিমা নির্মাণ; দেবতার ঘর সাজানো; বিভিন্ন ধরনের বাদ্যের আয়োজন বিশেষ করে ঢাক, ঢোল, ঘণ্টা, কাঁসি, শঙ্খ ইত্যাদি; ভক্তদের সাথে ভাববিনিময়; কিছুটা বিচিত্রধর্মী খাওয়াদাওয়া; বিভিন্ন ধরনের আনন্দমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন; পরিচ্ছন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান ইত্যাদি।

পার্বণ পূজা অনুষ্ঠানকে অধিক অনন্দঘন করে তোলে। ফলে ঈশ্বর ও দেব-দেবীর প্রতি ভক্তি, একাগ্রতা, গভীর শ্রদ্ধাবোধ, নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সংহতি ইত্যাদির সৃষ্টি হয়।

এ-অধ্যায়ে আমরা পূজার উপকরণ বা উপচার এগুলো ব্যবহারের তাৎপর্য, নারায়ণ, মনসা ও শনিদেবের পরিচয়, পূজা-পদ্ধতি, পুষ্পাঞ্জলি ও প্রণামমন্ত্র ইত্যাদি সম্পর্কে জানব।

এ-অধ্যায়শেষে আমরা-

- ☐ • ☐ পূজার উপকরণের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- ☐ • ☐ পূজা-পার্বণ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক উপচার ব্যবহারের তাৎপর্য এবং সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব
- ☐ • ☐ মনসা দেবীর পরিচয় ও পূজাপদ্ধতি বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা করতে পারব
- ☐ • ☐ মনসাপূজার প্রণামমন্ত্র বলতে, লিখতে এবং সরলার্থ ব্যাখ্যা করতে পারব
- ☐ • ☐ মনসা দেবীর পূজার শিক্ষা ও প্রভাব বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা করতে পারব
- ☐ • ☐ নারায়ণ ও শনিদেবের পরিচয় ও পূজাপদ্ধতি বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করতে পারব
- ☐ • ☐ নারায়ণ ও শনিদেবের প্রণাম মন্ত্র বলতে, লিখতে এবং সরলার্থ ব্যাখ্যা করতে পারব
- ☐ • ☐ পারিবারিক জীবনে নারায়ণ ও শনিপূজার শিক্ষা ও প্রভাব বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করতে পারব
- ☐ • ☐ মনসা, নারায়ণ ও শনিপূজার শিক্ষা উপলব্ধি করে শ্রদ্ধাভরে পূজা অর্চনায় উদ্বুদ্ধ হব
- ☐ • ☐ প্রাকৃতিক উপচার সংরক্ষণে যত্নশীল হব
- ☐ • ☐ পূজা পার্বণের জন্য প্রাকৃতিক উপচার সংগ্রহ এবং পূজা-পার্বণের ধর্মীয় নান্দনিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করব।

পাঠ ১ ও ২ : পূজা-উপকরণের ধারণা এবং পূজা-উপকরণ ব্যবহারের তাৎপর্য ও সংরক্ষণ

হিন্দুধর্মে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করা হয়। পূজা করার বিভিন্ন রীতি-নীতি রয়েছে, যাকে পূজাবিধি বলা হয়। বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা সঠিকভাবে করার জন্য ও পূজার রীতিনীতিসমূহ সঠিকভাবে পালন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের সমগ্রীর প্রয়োজন হয়। এসকল পূজাসামগ্রীকে পূজার উপকরণ বা উপচার হিসেবে অভিহিত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পূজার রীতিনীতি বা বিধি অনুসারে অভিষ্টদেবতা বা দেবীর জন্য নৈবেদ্য সমর্পণ করতে হয়। নৈবেদ্যের জন্য বিভিন্ন ধরনের ফল, মিষ্টি বা অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন হয়। এগুলোকে পূজার উপকরণ বা উপচার বলে।

দেব-দেবীর পছন্দ অনুসারে পূজা উপকরণেরও ভিন্নতা রয়েছে। তবে সাধারণভাবে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করার জন্য নিম্নবর্ণিত উপকরণসমূহ ব্যবহৃত হয়ে থাকে-

১. **বিগ্রহ বা প্রতিমা** : পূজায় দেব-দেবীর বিগ্রহ বা প্রতিমা নির্মাণ করা হয়।

২. **কলস বা মাটির পাত্র** : পূজার উপকরণ হিসেবে প্রথাগত

নিয়ম অনুসারে মাটির বা ধাতুর তৈরি কলস ব্যবহার করা হয়। পূজার সময় কলসটি গঙ্গা নদীর জল বা প্রবাহমান পরিষ্কার জল দিয়ে পূর্ণ করা হয়। কলসকে মঞ্জালঘটও বলা হয়। অর্থাৎ কলস বা ঘট একটি মাজালিক প্রতীক। কলস বা

ঘটকে ধরিত্রীমায়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং ঐশ্বরিক সচেতনতা বৃদ্ধির প্রতীক হিসেবেও বর্ণনা করা হয়েছে।



কলসের মুখে আম্রপল্লব স্থাপন করা হয় এবং তার উপর একটি সবুজ নারিকেল স্থাপন করা হয়। আম্রপল্লব ও নারিকেল মহাবিশ্বকে নির্দেশ করে। আম্রপল্লবের সাথে সজীবতার সম্পর্ক রয়েছে এবং একে ভালোবাসার ও উর্বরতার প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পূর্ণ কলস পাঁচটি উপাদানকে নির্দেশ করে। কলসের সবচেয়ে চওড়া অংশ পৃথিবীকে নির্দেশ করে, প্রসারিত কেন্দ্র জলকে নির্দেশ করে, কলসের ঘাড় অগ্নিকে নির্দেশ করে, মুখের খোলা অংশ বায়ুকে নির্দেশ করে কলসের মুখের উপর নারিকেল ও আম্র পল্লবকে আকাশ বা ইথার হিসেবে ধরা হয়।

৩. **প্রদীপ** : পূজার একটি উপকরণ প্রদীপ। প্রদীপ সৃষ্টি আলো সকল অন্ধকারকে দূর করে বলে একে জ্ঞানের প্রতীক হিসেবে ধরা হয়। প্রদীপ আমাদের জীবনের আলো ও আত্মাকে নির্দেশ করে।



৪. **শঙ্খ** : শঙ্খ মঞ্জালসূচক পূজা উপকরণ যা সৃষ্টির পবিত্র ধ্বনি সৃষ্টি করে। সমুদ্রের শঙ্খ ঘড়ির কাঁটার মতো ডান দিকে আবর্তিত হয়ে সকলের জন্য আশীর্বাদ প্রদান করে। এর সুরেলা ধ্বনি যেন সকলকে জ্ঞানের জগতে, ভক্তির জগতে আহ্বান জানায়—তোমরা এসো, দেবতার কাছে আনত হও, আত্মনিবেদন করো।



৫. **ফুলের মালা** : দেব-দেবীদের সম্মানিত ও সজ্জিত করার মাজালিক উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৬. **আসন** : দেবতাদের বসার জন্য ব্যবহার করা হয়।

৭. **মুকুট** : মুকুট দেবতাদের উচ্চ সম্মানের প্রতীক।

৮. **পান-সুপারি** : সুপারির কঠিন অংশ আমাদের অহমবোধের প্রতীক যা পূজার শেষে দেবতা বা দেবীর কাছে আত্মসমর্পণ করা হয়।

৯. **কর্পূর** : সুগন্ধি কর্পূরও পূজায় ব্যবহৃত হয়।

১০. **গঞ্জাজল** : দেব-দেবীকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার জন্য পবিত্র গঞ্জার জল ব্যবহার করা হয়। কেননা হিন্দু ধর্মগ্রন্থ অনুসারে গঞ্জার জল পবিত্র। এ-জলে বিভিন্ন ধরনের রোগ পীড়া ভালো করার ক্ষমতা বিদ্যমান। এ ছাড়াও এ-জল আধ্যাত্মিক চিন্তাচেতনা বৃদ্ধি ও বৈষয়িক সম্পদবৃদ্ধির সহায়ক।
১১. **ধূপকাঠি** : ধূপকাঠি আমাদের ইচ্ছাসমূহ নির্দেশ করে যা দেব-দেবীর পূজার সময় বিশেষ পাত্রে রেখে প্রজ্জ্বলিত করা হয়।
১২. **থালী** : থালায় বিভিন্ন সামগ্রী পূজার উদ্দেশ্যে রাখা হয়।
১৩. **ধূপ** : ধূপ এক ধরনের সুগন্ধযুক্ত ঘোঁয়া সৃষ্টিকারী পূজা উপকরণ যা আমাদেরকে খারাপ শক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত করে বলে বিবেচনা করা হয়।
- ১৪ **চন্দন** : চন্দনকাঠ সুগন্ধি। চন্দনকাঠ জলে ঘষে অনুলেপন তৈরি করা হয়। চন্দনের গন্ধ পবিত্র পরিবেশের সৃষ্টিকরে। এ-কারণেই দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে সচন্দন পুষ্প বা বিলুপত্র নিবেদন করা হয়। চন্দন একটি মঙ্গলজনক ও নান্দনিক পূজা-উপকরণ।
- ১৫ **আবির** : এক ধরনের লাল রংয়ের গুঁড়া যা দেব-দেবীদের জন্য ব্যবহার করা হয়।
- ১৬ **চাল** : বস্ত্র গত পূজা উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
১৭. **দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য সমর্পণ** : ফুল, ফল, মিষ্টিজাতীয় খাদ্য ইত্যাদি নৈবেদ্য হিসেবে প্রদান করা হয় যা দেব-দেবীর কাছে আমাদের আত্মসমর্পণ ও আত্মত্যাগ করাকে নির্দেশ করে।
১৮. **পঞ্চরতি** : একই সাথে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করা হয় এমন একটি পূজা-উপকরণ।
১৯. **ঘণ্টা** : পূজায় ঘণ্টা বাজানো হয়। একটি মঙ্গলজনক শব্দসৃষ্টিকারী পূজা-উপকরণ।
২০. **হলুদ** : হলুদ পরিশুদ্ধ চিন্তাকে নির্দেশ করে এবং মনকে আকর্ষণ করে। এ ছাড়াও হলুদ দেবী দুর্গার প্রতীক। হলুদে ভেষজ গুণ রয়েছে।
২১. **পবিত্র সুতা** : যজ্ঞের জন্য প্রয়োজন হয়।

একক কাজ : পূজার উপচারসমূহের নাম লেখ।

নতুন শব্দ : সমার্থক, বিচিত্রধর্মী, সম্ভ্রীতি, পঞ্চরতি।

পাঠ ৩ ও ৪ : মনসাদেবীর পরিচয় ও পূজাপদ্ধতি

মনসাদেবীর পরিচয়

মনসা সর্পের দেবী। তিনি সর্পকুলের জননী। তিনি আমাদের সর্পভয় থেকে রক্ষা করেন। তিনি উর্বরতা ও সমৃদ্ধির দেবী হিসেবেও পরিচিত। বাংলাদেশসহ পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে মনসা-দেবীর পূজা করা হয়। মনসা লৌকিক দেবী। পরে পৌরাণিক দেবীরূপে পরিগণিত হয়েছেন। দেবী মনসা বিষহরি নামেও পরিচিত। কেননা তিনি সাপের বিষ হরণ করে থাকেন। ব্রহ্মার উপদেশে ঋষি বশিষ্ঠ সর্পমন্ত্রের সৃষ্টি করেন এবং তাঁর তপস্যার দ্বারা মন থেকে সেই মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে মনসার আবির্ভাব ঘটে। মন থেকে সাকার রূপ লাভ করেছেন বলে এর নাম হয়েছে মনসা। পুরাণ মতে, তিনি জগৎকারু মুনির পত্নী, অস্ত্রি কের মাতা এবং সাপের রাজা বাসুকির বোন। তাঁর পিতার নাম কশ্যপমুনি এবং মাতার নাম কাদ্রু (Kadru)। তিনি নাগমাতা নামেও পরিচিত।



মনসাদেবীর রূপ

আকৃতিগত দিক থেকে মনসাদেবীর চারটি হাত রয়েছে এবং তিনি গৌরবর্ণা। তাঁর আরেক নাম তাই জগদগৌরী। চন্দ্রের মতো সুন্দর এবং প্রসন্ন তাঁর মুখমণ্ডল। অরুণ বর্ণের অর্ধাং ভোরের সূর্যের আলোর মতো লাল রঙের কাপড় তিনি পরিধান করেন। তিনি সোনার অলংকার পরে থাকেন। কয়েকটা সাপ তাঁকে জড়িয়ে থাকে, যেন তাঁর অলংকার। হাঁস তাঁর বাহন। প্রসন্ন মুখে তিনি হাঁসের ওপর বসে থাকেন। এ ছাড়াও আটটি সাপ তাঁর হাত, মুকুট ও পাদদেশ ঘিরে থাকে।

মনসা-পূজাপদ্ধতি

আষাঢ় মাসের পূর্ণিমার পরের তিথিকে নাগপঞ্চমী তিথি বলে। নাগপঞ্চমী তিথিতে উঠানে সিঁজ গাছ স্থাপন করে তাতে মনসাদেবীর পূজা করা হয়। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে মনসাদেবীর পূজা করার বিধান রয়েছে। বর্তমানে মনসা মন্দিরে মনসার পূজা করা হয়। পারিবারিক পর্যায়ে পারিবারিক মন্দিরে মনসাদেবীর পূজা করা হয়। এ-পূজা করার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো সাপের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া। মনসাপূজা করার জন্য অন্যান্য পূজার মতো সাধারণ পূজাবিধি অনুসরণ করতে হয়। সাধারণভাবে দেবী মনসার পূজাপদ্ধতি হিসেবে পূজার প্রারম্ভে সংকল্পগ্রহণ, মনসার প্রতিমা স্থাপন, আচমন, চক্ষুদান প্রভৃতি বিধি অনুসরণ করতে হয়। এ ছাড়াও মনসাপূজার ক্ষেত্রে মনসার ধান, আবাহন মন্ত্র পাঠ এবং পূজামন্ত্রপাঠ করতে হয়। অতঃপর মনসাদেবীকে স্নানমন্ত্র পাঠ করে স্নান করাতে হয় এবং অষ্ট নাগমন্ত্র পাঠের মাধ্যমে দেবীর পূজা আরম্ভ করতে হয় এবং শেষে পুষ্পাঞ্জলি ও প্রণামমন্ত্রের মাধ্যমে পূজা সমাপন করতে হয়। সবশেষে সাধারণত দেবী প্রতিমাকে বিসর্জন দেওয়া হয়।

পাঠ ৫ ও ৬ : মনসাদেবীর প্রণামমন্ত্র ও মনসাপূজার শিক্ষা ও প্রভাব

মনসাদেবীর প্রণামমন্ত্র

অস্তি কস্য মনেৰ্মতা ভগিনী-বাসুকেন্ত থা।

জগৎকারমুনৈঃ পত্নী মনসাদেবী নমোহঙ্ক তে ॥

সরলার্থ

অস্তি ক মুনির মাতা, নাগরাজ বাসুকীর ভগ্নী, জরতকার মুনির পত্নী মনসাদেবীকে প্রণাম করি।

মনসাদেবীর প্রভাব ও গুরুত্ব

মনসাদেবীর পূজা করলে সাপের ভয় থাকে না। মনসাদেবীর মাহাত্ম্য নিয়ে অনেক উপাখ্যান রচিত হয়েছে। এসকল উপাখ্যানে মনসাদেবীকে পূজা না করার ভয়াবহ পরিণাম এবং পূজা করার সুফল বর্ণিত হয়েছে। মনসাদেবীর পূজার সময় এসকল উপাখ্যান শোনানো হয়। এরূপ উপাখ্যান অবলম্বনে অনেক পালাগানও রচনা করা হয়েছে। ‘মনসার ভাসান’ এরকম একটি পালাগান। এ ছাড়াও মনসাপূজার মাধ্যমে হিন্দুধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিভিন্ন সাপ সম্পর্কে ধারণা গ্রহণের সুত্রপাত ঘটে। বিষধর সাপের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ফলে সর্পদংশনের ঘটনা কম সংগঠিত হয়ে থাকে। এ-পূজার মূল শিক্ষা হলো সর্পকে বশীভূতকরণের কৌশল আয়ত্ত করা যার মাধ্যমে শত্রুকে সুপথে ফিরিয়ে এনে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

একক কাজ : মনসাদেবীর পূজার সুফলগুলো লেখ।

নতুন শব্দ : প্রজ্বলিত, জগদগৌরী, নাগপঞ্চমী, কাদু।

পাঠ ৭ ও ৮ : নারায়ণ দেবের পরিচয় ও পূজা পদ্ধতি

নারায়ণ দেবের পরিচয়

বিষ্ণুর সহস্রনাম অনুসারে ভগবান বিষ্ণুর ২৪৫তম নাম নারায়ণ। হিন্দুধর্ম অনুসারে নারায়ণ পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরমেশ্বর নামে পরিচিত। নারা শব্দের অর্থ মানুষ এবং অয়ন (Ayana) শব্দের অর্থ আশ্রয়। সুতরাং নারায়ণ শব্দের অর্থ হচ্ছে সকল জীবের জন্য আশ্রয়স্থল। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও পুরাণ অনুসারে দেবতা নারায়ণকে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

নারায়ণ দেবের বর্ণনা

হিন্দুধর্মগ্রন্থ অনুসারে ভগবান বিষ্ণু শ্যামবর্ণ। তাঁর চার হাত বিদ্যমান এবং চার হাতে চার ধরনের বস্তু রয়েছে। এক হাতে রয়েছে পদ্ম, একহাতে শঙ্খ, এক হাতে চক্র এবং আর এক হাতে রয়েছে গদা। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অনুসারে তিনি বিশ্বরূপ



(Vishvarup)। তাঁর সহধর্মিণীর নাম দেবী লক্ষ্মী। নারায়ণই বিষ্ণু বা হরি। তিনি এ-বিশ্বের পালনকর্তা। তাঁর বাহন গরুড়।

নারায়ণ পূজার উদ্দেশ্য : ভগবান নারায়ণ সকল জীবের আশ্রয়স্থল। নারায়ণ পূজার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো দেবতা নারায়ণের আশীর্বাদ লাভ করা এবং নারায়ণের কৃপায় পারিবারিক সুখ-শান্তি অর্জন করা।

সময়কাল : যে-কোনো সময় বা মাসে নারায়ণ পূজা করা যায়। বৈশাখ মাসে নারায়ণ পূজার প্রচলন অধিক লক্ষ করা যায়।

পূজাপদ্ধতি

প্রতিমারূপে, শালগ্রাম শিলারূপে, তাম্রপাত্রে বা জলে নারায়ণ পূজা করা হয়। শালগ্রাম শিলা একপ্রকার সামুদ্রিক জীবাশ্ম যা ভারতের গড়কী নদীর তীরে শালগ্রাম নামক গ্রামে পাওয়া যায়। এই জীবাশ্মটি গোল, কালো রংয়ের হয়ে থাকে। এই শিলাকে নারায়ণ চক্রও বলা হয়। নারায়ণ পূজায় অন্যান্য পূজার মতোই সাধারণ পূজাবিধি অনুসরণ করতে হয়। তারপর বিশেষভাবে নির্ধারিত মন্ত্রে নারায়ণের পূজা করা হয়। সাধারণত নারায়ণ পূজার জন্য সাদা ফুলের প্রয়োজন হয়। তুলসীপাতা নারায়ণের প্রিয়।

পাঠ ৯ ও ১০ : নারায়ণের প্রণামমন্ত্র ও নারায়ণ পূজার শিক্ষা ও প্রভাব

নারায়ণের প্রণাম মন্ত্র

ওঁ নমো ব্রাহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।

জগদ্বিত্য কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।

সরলার্থ : নারায়ণ ব্রাহ্মণ্যদেব। তিনি কৃষ্ণ, তিনি গোবিন্দ। তিনি পৃথিবী, ব্রাহ্মণ ও জগতের হিতসাধন করেন। তাঁকে বারবার নমস্কার জানাই।

নারায়ণ পূজার শিক্ষা ও প্রভাব

নারায়ণ পালনের দেবতা। তাই নারায়ণ দেবের কাছ থেকে আমরা আমাদের সন্তানসন্ততি তথা সকল জীবকে দায়িত্বের সঙ্গে পালন করার শিক্ষা পাই। নারায়ণ দেব দুষ্ণের দমন করেন। আমরাও প্রয়োজনে দুষ্ণের দমন করব, এ-শিক্ষাও নারায়ণ পূজার মধ্য দিয়ে আমরা লাভ করি।

নারায়ণকে স্মরণ করলে পাপ দূরীভূত হয়। হৃদয় পবিত্র হয়। মনে শক্তির সঞ্চার হয়। নারায়ণ আমাদের প্রতিপালনকারী দেবতা। তিনি আমাদের দেহের মধ্যে আত্মরূপে বিরাজ করছেন। নারায়ণ পূজার মাধ্যমে ভক্তেরা ভগবান নারায়ণের আশীর্বাদ লাভ করে থাকেন। তাঁর আশীর্বাদ ভক্তদের দৈনন্দিন জীবনকে সুখ ও সমৃদ্ধিতে ভরে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। নারায়ণ পূজার ফলে মানুষের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ভক্তগণ শান্তির জন্য পরম শ্রদ্ধাভরে ভগবান নারায়ণের উপাসনা করেন এবং তাঁর মহিমা কীর্তন করেন।

একক কাজ : নারায়ণ পূজার পাঁচটি প্রভাব লেখ।

নতুন শব্দ : শালগ্রাম শিলা, গড়কী, জীবাশ্ম, তাম্রপাত্র।

পাঠ ১১ ও ১২ : শনিদেবের পরিচয় ও পূজাপদ্ধতি

শনিদেবের পরিচয়

হিন্দুধর্মে অন্যান্য দেবতার মতো শনিদেবও একজন উপাস্য দেবতা। শনি দেবতা সূর্য ও ছায়ার পুত্র। তিনি নবগ্রহের অন্যতম। জীবনে চলার ক্ষেত্রে যেসকল বাধাবিপত্তি ঘটে, শনিদেব তা দূর করে থাকেন। তাই হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা নিজেদেরকে বাধাবিপত্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শনির পূজা করে থাকেন।



শনিদেবের বর্ণনা

শনির গায়ের রং কালো এবং কালো পোশাক পরিহিত। তাঁর হাতে তরবারি, তীর, খড়্গ দেখা যায় এবং কাক তাঁর বাহন।

শনিদেবের পূজা

সময়কাল : শনি দেবতার নাম অনুসারে শনিবারে শনির পূজা করা হয়।

শনি পূজার উদ্দেশ্য : এ-পূজা করার উদ্দেশ্য হলো- শনি দেবতাকে সন্তুষ্ট রাখা, বিভিন্ন ধরনের রোগ-পীড়া থেকে মুক্ত থাকা এবং মনে শান্তি বজায় রাখা।

শনিদেবের পূজাপদ্ধতি

সাধারণত পূজা মন্দিরে বা পারিবারিক পর্যায়ে সূর্যাস্তে শনিপূজার আয়োজন করা হয়। পূজা আয়োজনের ক্ষেত্রে অন্যান্য পূজার মতো সকল ধরনের পবিত্রতা ও বিধি অনুসরণ করা হয়। পারিবারিক পর্যায়ে শনিপূজা আয়োজনের ক্ষেত্রে বাড়ির আঙিনাকে বেছে নেওয়া হয় এবং শনিদেবের পাঁচালি পড়ে শনিপূজা করা হয়। মন্ত্রপাঠের মাধ্যমেও শনিপূজা করা হয়ে থাকে। সাধারণত গৃহের অভ্যন্তরে শনিপূজা করা হয় না এবং পাড়া-প্রতিবেশীদেরকে পূজা অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ করতে হয়। শনিপূজায় শনির ভোগ হিসেবে পাঁচ প্রকারের ঋতুভিত্তিক ফল এবং পাঁচ রকমের ফুল নিবেদন করা হয়। কোনো কোনো অঞ্চলে প্রসাদ হিসেবে খিচুড়ি, দুধ, চিনি, বাতাসা, কলা, গুড়, মিষ্টান্ন ও ময়দার ফলার আয়োজন করা হয়। খিচুড়ি প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে মুগের ডাল ব্যবহার করতে হয়। এ ছাড়াও পূজার উপকরণ হিসেবে পান-সুপারি, মধুর বাটি, মাষকলাই, কালো তিল, বেগুনি বা কালো রঙের ফুলের প্রয়োজন হয়। শনিপূজাশেষে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

পাঠ ১৩ ও ১৪ : শনিদেবের পূজার প্রণাম মন্ত্র ও শনিপূজার শিক্ষা ও প্রভাব

শনিদেবের প্রণাম মন্ত্র

ওঁ নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যং রবিসূত-মহাগ্রহম্ ।

ছায়ায়া গর্ভসঙ্কতং তুং নমামি শনৈশ্চরমা।

সরলার্থ

তোমার দেহ কৃষ্ণবর্ণ, তুমি সূর্যদেবতার পুত্র, ছায়ার গর্ভে তোমার জন্ম, তুমি আমার প্রণাম গ্রহণ করো।

শনিদেবতার শিক্ষা ও প্রভাব

শনিদেবের পূজা করলে আমাদের আপদ-বিপদ দূর হয়। আমাদের দায়িত্বহীনতা, অপবিত্রতা ও পাপের কারণে শনিদেব খুব রাগত হন। তখন আমরা কষ্ট পাই। কষ্টের মধ্য দিয়ে আমাদের উপলব্ধি ঘটে। আমরা তখন দায়িত্বশীলতা ও পবিত্রতার প্রতি মনোযোগী হই। মা যেমন সন্তানকে গভীর ভালোবাসা সত্ত্বেও সংশোধনের জন্য শাস্তি দেন, তেমনি শনিদেবও কখনও কখনও আমাদের কষ্ট দিয়ে সংশোধন করেন এবং অধর্মের পথ থেকে ধর্মপথে ফিরিয়ে আনেন। তাই প্রতি সপ্তাহে শনিবার শনিপূজা করা হিন্দুদের একটি নিয়মিত ধর্মকৃত্য।

দলীয় কাজ : শনিদেবের পূজায় ব্যবহৃত উপচারের একটি তালিকা তৈরি কর।

নতুন শব্দ : নবগ্রহ, পাঁচালি, কৃষ্ণবর্ণ।

অনুশীলনী**শূন্যস্থান পূরণ কর :**

১. সাধারণত গৃহের শনিপূজা করা যায় না।
২. পূজাসামগ্রীকে বা বলে।
৩. জ্ঞাপন করাকে পূজা বলে।
৪. শব্দ পূজা উপকরণ।
৫. থেকে সাকার রূপ লাভ করেছে বলে এর নাম মনসা।

ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর :

| বাম পাশ | ডান পাশ |
|----------------------------|------------------------|
| ১. পার্বণ শব্দের অর্থ | মহাবিশ্বকে নির্দেশ করে |
| ২. নারায়ণের প্রতিকৃতি | পৃথিবীকে নির্দেশ করে |
| ৩. কলসের সবচেয়ে চওড়া অংশ | শনি দেবতা |
| ৪. আমপাতা ও নারিকেল | উৎসব |
| ৫. সূর্য ও ছায়ার পুত্র | শালগ্রাম শিলা |

১. দেব-দেবীর পূজা কেন করা হয় ব্যাখ্যা কর ।
২. নৈবেদ্য বলতে কী বোঝা ?
৩. নারায়ণ পূজার তিনটি সুফল ব্যাখ্যা কর ।
৪. শালগ্রাম শিলা কী ?
৫. শনিদেবের পূজায় কী কী উপকরণ ব্যবহার করা হয় ব্যাখ্যা কর ।

১. সমাজজীবনে নারায়ণ পূজার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।
২. দেব-দেবীর পূজায় বিভিন্ন উপচার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে এর একটি তালিকা প্রস্তুত কর।
৩. পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে মনসাপূজার প্রভাব বিশ্লেষণ কর।

১. মনসা পূজা করা হয় কোন তিথিতে ?

| | |
|--------------------|------------------|
| ক. শ্রীপঞ্চমী | খ. নাগ পঞ্চমী |
| গ. কৃষ্ণ ত্রয়োদশী | ঘ. শুক্লা অষ্টমী |

২. দেব-দেবীর পূজায় উপচার নিবেদনের তাৎপর্য হলো—

- পূজাকে আনন্দদায়ক করা
- মনের একাগ্রতা বৃদ্ধি করা
- বিধিসম্মত পূজা সমাপন করা

[illegible]

অরণীর মা শারীরিক অসুস্থ থাকায় শনিবার সন্ধ্যায় অরণীকে পূজাবিধি না জেনেই বাড়ির উঠানে শনি পূজার আয়োজন করতে হয়। পূজার উদ্দেশ্যে অরণী চার রকমের ফুল ও ফল সংগ্রহ করে। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন উপচার সহযোগে পূজার পাঁচালি পড়ে পূজা সন্ধান করে উপস্থিত সকলের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করে। কিন্তু পূজাটি বিধিসম্মতভাবে হয়েছে কিনা এ নিয়ে অরণীর মনে সংশয় থেকে যায় এবং সে মানসিক অশান্তিতে ভোগে।

৩. পূজাবিধি অনুসারে শনিপূজায় অরণীর কত রকমের ফুল ও ফল নিবেদনের প্রয়োজন ছিল ?

- | | |
|--------|---------|
| ক. দুই | খ. তিন |
| গ. চার | ঘ. পাঁচ |

৪. অরণীর মানসিক দ্বন্দ্বের কারণগুলো হলো -

- দায়িত্বহীনতা
- ঋটিমুক্তভাবে পূজা সম্পন্ন না করা
- শনিদেব বুফট হতে পারেন এই ভাবনা।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন :

তন্ময়দের বাড়িতে প্রতিবছর মনসাপূজার আয়োজন করা হয়। এ-পূজাকে কেন্দ্র করে এলাকার প্রতি বাড়িতেই চলে উৎসব ও পারিবারিক নানা আয়োজন। পুরোহিত সংক্ষিপ্ত উপচার নিবেদনে পূজাপদ্ধতির এক পর্যায়ে পশুবলিদান করেন এবং পূজা সম্পন্ন করেন। বলিদানে তন্ময়ের মনে নানা প্রশ্নের জন্ম দেয়, কেন জীবহত্যা, কী তার শিক্ষা? এ-সমাজজীবনে এ-পূজায় শান্তির পথ কী ?

- কোন দেবীকে সর্পকুলের জননী বলা হয় ?
- পূজায় উপচার নিবেদনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।
- পুরোহিত কীভাবে মনসাপূজা সম্পন্ন করেন ? তোমার পাঠিত পূজাবিধির আলোকে ব্যাখ্যা কর।
- তন্ময়ের মনের প্রশ্নগুলোর সমাধান উক্ত পূজার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

ষষ্ঠ অধ্যায় ধর্মীয় উপাখ্যানে নৈতিক শিক্ষা

নীতি বা নৈতিকতা ধর্মের অঙ্গ এবং নীতি-সম্পর্কিত শিক্ষাকে নৈতিক শিক্ষা বলে। যত শিক্ষাই গ্রহণ করা হোক না কেন, যদি নৈতিকতা গড়ে না ওঠে, সে-শিক্ষা মূল্যহীন।

হিন্দুধর্মবিষয়ক গ্রন্থসমূহে উপাখ্যানের মধ্য দিয়েও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এ-অধ্যায়ে আমরা দেশপ্রেম ও নৈতিক গুণের ধারণা উক্ত বিষয়ে ধর্মীয় উপাখ্যান এবং ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে দেশপ্রেম ও অধ্যবসায়ের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা জানব।



এ-অধ্যায়শেষে আমরা -

- দেশপ্রেম ও অধ্যবসায় ধারণা দুটি ব্যাখ্যা করতে পারব
- ধর্মগ্রন্থ থেকে দেশপ্রেম ও অধ্যবসায়ের দৃষ্টান্তমূলক উপাখ্যান বর্ণনা করতে পারব
- উপাখ্যানে বর্ণিত ঘটনার শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারব
- ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে দেশপ্রেম ও অধ্যবসায়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- দেশপ্রেম ও অধ্যবসায়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে নিজ আচরণে তার প্রতিফলন ঘটাতে পারব।

পাঠ ১ : দেশপ্রেম

দেশপ্রেম বলতে বোঝায় দেশের প্রতি ভালোবাসা। মানুষ যে-দেশে জন্মগ্রহণ করে, তার মাটি-জল-আলো-বাতাস তার দেহকে পুষ্ট করে, তাকে বাঁচিয়ে রাখে। বড় হয়ে মানুষ তার মাতৃভূমির প্রতি মমতা অনুভব করে। মাতৃভূমির প্রতি এই মমত্ববোধই দেশপ্রেম। দেশ ও জাতির মজ্জালের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার নামই দেশপ্রেম। দেশপ্রেম ধর্মের অঙ্গ। ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে— ‘জননী জন্মভূমিচ স্বর্গাদপি গরীয়সী।’ অর্থাৎ জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও বড়। তাই যিনি দেশপ্রেমিক, তিনি দেশের স্বার্থকে ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দেন। তিনি সবসময় দেশ ও দেশবাসীর কল্যাণের জন্য কাজ করে থাকেন। দেশের কোনো বিপদে দেশপ্রেমিক কখনো নীরব থাকতে পারেন না। নিজের জীবনের বিনিময়েও তিনি সে-বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়েন। দেশের মজ্জালের জন্য প্রয়োজন হলে নিজের জীবন বিসর্জন দিতেও দ্বিধাবোধ করেন না। দেশপ্রেম মানব জীবনের একটি মহৎ গুণ। পৃথিবীতে যত মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করেছেন, সকলেই ছিলেন দেশপ্রেমিক।

পৌরাণিক যুগে জনা, বিদুলা, কাক্তবীর্যার্জুন প্রমুখ দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছেন। একালে এ-মহাদেশে মহাত্মা গান্ধী, ক্ষুদিরাম, মাস্টারদা সূর্যসেন, প্রীতিলতা, রানি রাসমণি, চিত্তরঞ্জন দাস, বাঘা যতীন, রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার, বঙ্গাবন্দু শেখ মুজিবুর রহমান, জাহানারা ইমামসহ আরও অনেকের নাম করা যায়, যাঁরা দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছেন। দেশ ও জাতির জন্য তাঁদের অবদান স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে। মানুষ তাঁদের স্মরণ করে, তাঁদের প্রদর্শিত পথে চলতে চেষ্টা করে।

একক কাজ : তোমার জানা একজন দেশপ্রেমিকের অবদান সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

নতুন শব্দ : মমত্ববোধ, স্বর্গাদপি, গরীয়সী, বিসর্জন, স্বর্ণাক্ষর, প্রদর্শিত।

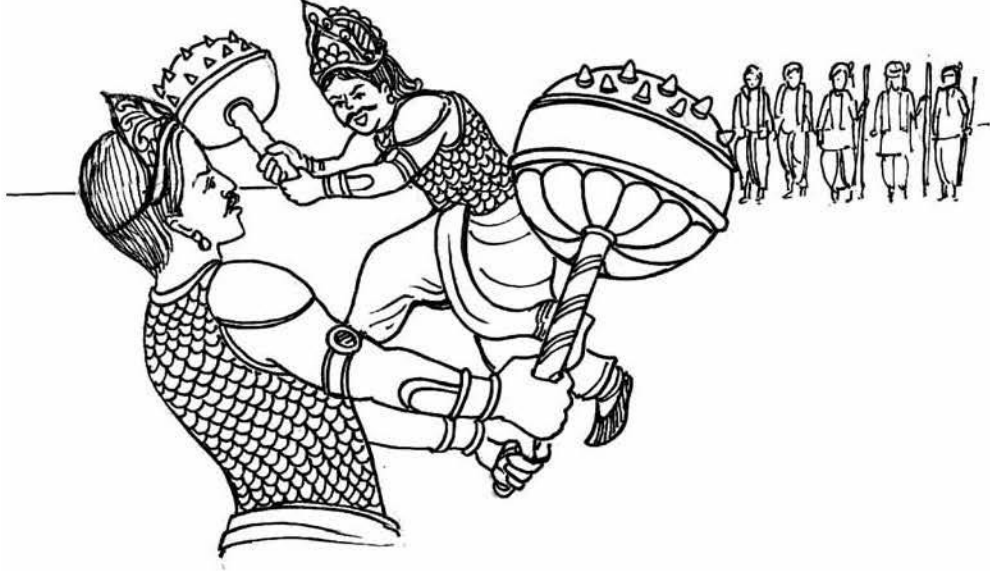
পাঠ ২ ও ৩ : কাক্তবীর্যার্জুনের দেশপ্রেম

প্রাচীনকালে চন্দ্রবংশীয় এক রাজা ছিলেন। তাঁর নাম কাক্তবীর্যার্জুন। তিনি ছিলেন যেমন কর্তব্যপারায়ণ, তেমনি বীর ও দেশপ্রেমিক। রাজকার্যের ক্লান্তি দূর করার জন্য তিনি একবার রাজধানীর বাইরে অবকাশ যাপন করছিলেন।

গুপ্তচরের মুখে এ-খবর পেয়ে লঙ্কার রাজা রাবণ সুযোগ বুঝে তাঁর রাজ্য অক্রমণ করলেন। কাক্তবীর্যার্জুনের এক সেনানায়কের নেতৃত্বে ঘোর যুদ্ধ শুরু হলো। এরই মধ্যে সংবাদ পৌছানো হলো মহারাজ কাক্তবীর্যার্জুনের কাছে। শূনে মহারাজ ক্রোধে আগুনের মতো জ্বলে উঠলেন :

কী ! আমার রাজ্য আক্রান্ত! আমার মাতৃভূমি শত্রুর বিধাক্ত নিশ্বাসে বিপর্যস্ত ! আমি এখনই যুদ্ধে যাব।

একথা ভেবে রাজা কাক্তবীর্যার্জুন অবকাশ যাপন স্থগিত করে সোজা যুদ্ধক্ষেত্রে চলে গেলেন। দারুণ যুদ্ধ শুরু হলো। একপক্ষ অক্রমণকারী। আরেকপক্ষ আক্রান্ত, কিন্তু দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ। পরাজিত হলে দেশ হবে পরাধীন। তাই সৈন্যগণ কাক্তবীর্যার্জুনের নেতৃত্বে প্রাণপণ যুদ্ধ করল। অবশেষে জয় হলো কাক্তবীর্যার্জুনের। রাবণ পরাজিত হয়ে বন্দি হলেন কাক্তবীর্যার্জুনের হাতে। স্বর্গে এই বার্তা পৌঁছে গেল। কথটা মহামুনি পুলস্ত্যর কানে গেল। এ-সময় তিনি স্বর্গলোকে ছিলেন। রাবণ পুলস্ত্যর নাতি। তাই তাঁর খুব দুঃখ হলো। তিনি স্বর্গ থেকে চলে এলেন কাক্তবীর্যার্জুনের রাজসভায়।



কার্তবীৰ্য্যার্জুন মহামুনি পুলস্ত্যকে দেখে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে বললেন, ‘কি সৌভাগ্য আমার, মেঘ না চাইতেই জল’— এই বলে তিনি পুলস্ত্যকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন।

কার্তবীৰ্য্যার্জুনের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে পুলস্ত্যমুনি বললেন, ‘তুমি দেবতাদের প্রিয়। ত্রিভুবন তোমার যশস্বীকর্তনে মুখরিত। রাবণ আমার নাতি। তাকে পরাজিত করে তুমি বন্দি করে কারাগারে রেখেছ। আমি তার মুক্তি চাই, বৎস।’

কার্তবীৰ্য্যার্জুন বললেন, ‘রাবণ আমার রাজ্য আক্রমণ করেছিল। আমার দেশপ্রেমিক যোদ্ধারা তাকে প্রতিহত করেছে।’

শুনে পুলস্ত্য বললেন, ‘তোমার গভীর দেশপ্রেম আর বীরত্বের কাছে রাবণ পরাজিত হয়েছে।’

কার্তবীৰ্য্যার্জুন বললেন, ‘আপনি পরম শ্রদ্ধেয়। আপনি যখন রাবণের মুক্তি চাইলেন, তখন তাকে মুক্তি দিয়ে আমি ধন্য হতে চাই।’

রাবণ মুক্তি পেলেন।

রাবণ তাঁর অপরাধ স্বীকার করলেন এবং অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইলেন।

পুলস্ত্য বললেন, ‘তোমাদের উভয়ের কল্যাণ হোক।’

পুলস্ত্যের মাধ্যমে অগ্নিসাক্ষী করে কার্তবীৰ্য্যার্জুনের সাথে রাবণের মৈত্রী স্থাপিত হলো। পুলস্ত্য বিদায় চাইলেন তাঁদের কাছে। কার্তবীৰ্য্যার্জুন আর রাবণ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে বিদায় জানালেন মহামুনি পুলস্ত্যকে।

পুলস্ত্য চলে গেলেন স্বর্গে। রাবণ ফিরে গেলেন তাঁর নিজের রাজ্যে।

কার্তবীর্যার্জুন চেয়ে রইলেন তাঁদের গমনপথের দিকে। তাঁর চোখে পড়ল শ্যামল প্রান্তর। এই তাঁর দেশ, তাঁর স্বাধীন রাজ্য। আনন্দে-আবেগে ভরে উঠল কার্তবীর্যার্জুনের হৃদয়।

উপাখ্যানের শিক্ষা : ‘দেশের স্বাধীনতার জন্য স্বার্থত্যাগ করে যারা যুদ্ধ করে, তাঁরা দেশপ্রেমিক।’

দলীয় কাজ : কার্তবীর্যার্জুনের দেশপ্রেম উপাখ্যানের শিক্ষার প্রায়োগিক দিক চিহ্নিত কর।

নতুন শব্দ : কার্তবীর্যার্জুন, গুপ্তচর, অবকাশ, উদ্বুদ্ধ, বার্তা, পুলকিত, সাক্ষাৎ।

পাঠ ৪ : সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে দেশপ্রেমের গুরুত্ব

দেশপ্রেম ধর্মের অঙ্গ। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ মানুষ দেশ ও সমাজের মঙ্গলের জন্য নিজের স্বার্থবুদ্ধির উপরে উঠে পরের হিতার্থে কাজ করেন। এটাই তাঁর জীবনের ব্রত। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ তার ধন-জন এমনকি জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে দ্বিধাবোধ করেন না। দেশের যখন সংকটকাল উপস্থিত হয়, যখন দেশ বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়, দেশের স্বাধীনতা হয় বিপর্যস্ত, যখন পরাধীনতা মানুষকে শৃঙ্খলিত করতে চায়, যখন বিদেশি শাসকের রক্তচক্ষু দেশ ও জাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়, তখনই মানুষ দেশপ্রেমের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং দেশের মর্যাদা রক্ষায় অকাতরে জীবন বিসর্জন দেন।

স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জাতীয়তাবোধ হলো দেশপ্রেমের প্রধান উৎস। স্বাধীনতার জন্য কত বীরের আত্মবলিদানে স্বদেশের মাটি হয় রক্তে রাঙা। ১৯৭১ সনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস তো দেশপ্রেমেরই এক জলন্ত দৃষ্টান্ত। দেশপ্রেমের অগ্নিমন্ত্রই লক্ষ লক্ষ বাঙালিকে তাদের জীবন উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

স্বদেশের যে-কোনো গৌরবে দেশপ্রেমিকমাত্রই গর্ববোধ করেন। তেমনি দেশের দুর্দিনে বা খারাপ সময়ে শঙ্কিত চিত্তে উদ্বোধ প্রকাশ করেন এবং নিঃশর্তে আত্মত্যাগ করতেও কুণ্ঠিত হন না। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নির্বিধায় জীবনকে উৎসর্গ করেন। যুগে যুগে দেশপ্রেমিকেরা দেশের জন্য, সমাজের মঙ্গলের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। হিন্দুধর্ম গ্রন্থে দেশপ্রেমকে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

শুধু বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করাই নয়, দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করাও দেশপ্রেম। দেশের সম্পদ রক্ষা করাও দেশপ্রেম। দেশের উন্নতির জন্য দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার মধ্য দিয়েও দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটে। রাষ্ট্র যাতে সঠিকভাবে শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়, সেজন্য যোগ্য নাগরিক হিসেবে দেশপ্রেমিক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। নিজের দেশের কল্যাণের জন্যই দক্ষ নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে হয়। কেবল নিজের বা নিজের পরিবারের স্বার্থ দেখলেই চলে না, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণের কথাও ভাবতে হয়। সমাজ তথা রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য সदा সচেষ্ট থাকতে হয়। এর নামও দেশপ্রেম। ত্যাগ ও তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে দেশপ্রেম নামক নৈতিক গুণটি অর্জন করতে হয়।

দেশপ্রেম মানুষকে উদার করে, দেশের মানুষকে ভালোবাসতে উদ্বুদ্ধ করে, আত্মসুখ বিসর্জন দেওয়ার প্রেরণা দান করে। দেশপ্রেম মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। যার মধ্যে দেশপ্রেম নেই তাকে যথার্থ মানুষ বলা যায় না। আত্মকেন্দ্রিক মানুষ সাধারণত দেশপ্রেমিক হয় না। দেশপ্রেমিক দেশের সম্পদ, দেশের স্বার্থ, দেশের মর্যাদা প্রভৃতিকে নিজের সম্পদ, নিজের স্বার্থ ও নিজের মর্যাদা বলে মনে করেন। তাই দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য, দেশের মর্যাদারক্ষায় আত্মোৎসর্গ করতেও পিছপা হন না। দেশের মর্যাদা রক্ষা করতে যুদ্ধে শহিদ হলে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়।

পরাদীনতা ব্যক্তিকে শৃঙ্খলিত করে রাখে। সমাজের অগ্রগতি তাতে ব্যাহত হয়। রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে পরাদীন ব্যক্তির কোনো ভূমিকা থাকে না। তাই রাষ্ট্রীয় জীবনে দেশপ্রেমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সুতরাং আমরা দেশপ্রেমিক হব এবং দেশের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকব। দেশের জন্য, দেশের মানুষের মজালের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতেও কুণ্ঠিত হব না।

নতুন শব্দ : হিতার্থে, উৎসর্গ, শৃঙ্খলিত, আত্মবলিদান, পিছপা।

পাঠ ৫ : অধ্যবসায়

কোনো লক্ষ্য অর্জনে বিশেষ যত্নসহকারে কঠোর সাধনার মধ্য দিয়ে বারবার চেষ্টা করার নামই অধ্যবসায়। অধ্যবসায় হচ্ছে কতিপয় গুণের সমষ্টি। চেষ্টা, উদ্যোগ, আন্তরিকতা, পরিশ্রম, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, একাগ্রতা ইত্যাদি গুণের সমন্বয়ে অধ্যবসায় নামক নৈতিক গুণটি গড়ে ওঠে। সংস্কৃতকে বাস্তব রূপদানের জন্য কঠোর পরিশ্রম আর ধৈর্যের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর মধ্যেই অধ্যবসায়ের সার্থকতা নিহিত। অধ্যবসায়ের গুণেই মানুষ বড় হয়। অসাধ্য সাধন করতে পারে। অধ্যবসায় ধর্মেরও অঙ্গ। ধর্মগ্রন্থে অধ্যবসায়কে একটি বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

ছাত্রজীবনে অধ্যবসায়ের গুরুত্ব সর্বাধিক। ছাত্রজীবন আর অধ্যবসায় একই সূত্রে গাঁথা। বিদ্যার্জনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। অলস, কর্মবিমুখ ও হতাশ শিক্ষার্থী কখনও বিদ্যালোভে সফলতা অর্জন করতে পারে না। একজন অধ্যবসায়ী শিক্ষার্থী অল্প মেধাসম্পন্ন হলেও তার পক্ষে সাফল্য অর্জন করা কঠিন নয়। কাজেই অকৃতকার্য শিক্ষার্থীকে হতাশ না হয়ে পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে অধ্যবসায়ে মনোনিবেশ করা উচিত। যে-ব্যক্তি অধ্যবসায়ী নয়, সে জীবনের কোনো সাধারণ কাজেও সফলতা লাভ করতে পারে না। জীবনের সফলতা এবং বিফলতা অনেকাংশে অধ্যবসায়ের উপরই নির্ভর করে। মনে রাখতে হবে জীবনসংগ্রামে সাফল্যলাভের মূলমন্ত্র হচ্ছে অধ্যবসায়। শুধু অধ্যবসায়ের বলেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, কাজী নজরুল ইসলাম, নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, রবার্ট ক্রস প্রমুখ মনীষী জগতে বিখ্যাত হয়েছেন।

তাই আমাদের সকলেরই উচিত অধ্যবসায়ের মতো মহৎ গুণটিকে আয়ত্ত করা।

দলীয় কাজ : অধ্যবসায় গুণটির প্রভাব লিখে একটি পোস্টার তৈরি কর।

নতুন শব্দ : সহিষ্ণুতা, মনোনিবেশ, কুসুমাস্তীর্ণ।

পাঠ ৬ : অধ্যবসায়ী একলব্য

অনেককাল আগের কথা। তখন হস্তি নাপুরের কাছে এক গভীর অরণ্য ছিল। সেখানে বাস করতেন নিষাদদের রাজা হিরণ্যধনু। তাঁর পুত্র একলব্য।

তাঁর ইচ্ছে হলো, হস্তিনাপুর নগরে গিয়ে অস্ত্র গুরু দ্রোণাচার্যের কাছ থেকে অস্ত্র বিদ্যা শিখবেন।

সে-সময়ে হস্তি নাপুরের রাজা ছিলেন ধৃতরাষ্ট্র। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব প্রমুখ পাণ্ডুপুত্রগণ এবং দুর্যোধন, দুঃশাসনসহ ধৃতরাষ্ট্রের অন্যান্য পুত্রগণকে অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা দিতেন দ্রোণাচার্য। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের বলা হয় কৌরব আর পাণ্ডুর পুত্রদের বলা হয় পাণ্ডব।

একদিন দ্রোণাচার্য কুরু-পাণ্ডবদের অস্ত্র শিক্ষা দিচ্ছেন। এমন সময় সেখানে একলব্য এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর কাঁধে ধনুক, হাতে তীর, মাথায় পাখির পালক, পরনে বকুল। তিনি দ্রোণাচার্যকে সার্বাঙ্গী প্রণাম করে বললেন, ‘গুরুদেব, আমি আপনার নিকট অস্ত্র বিদ্যা শিখতে চাই।’

দ্রোণাচার্য তার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘তোমার পরিচয় কী?’

একলব্য বললেন, ‘আমি নিষাদ বংশীয়। লোকে আমাদের ব্যাধ বলে। এখান থেকে দূরে অরণ্যে আমার বাস।’

দ্রোণাচার্য বললেন, ‘বৎস, এখানে আমি শুধু রাজপুত্রদের অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে থাকি। তোমাকে অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়।’

একথা শুনে একলব্য ভীষণভাবে দুঃখিত ও মর্মাহত হলেন। মনের দুঃখে তিনি বনে ফিরে গেলেন। গভীর বনে প্রবেশ করে একলব্য লতা-পাতা দিয়ে একটি কুটির নির্মাণ করলেন। তারপর তিনি মাটি দিয়ে দ্রোণাচার্যের একটি মূর্তি নির্মাণ করলেন। দ্রোণাচার্যকে মনে মনে গুরু মেনে তাঁর মূর্তির সম্মুখে তিনি অহর্নিশ তীর-ধনুক নিয়ে অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করতে লাগলেন। কঠোর অধ্যবসায়, নিরলস পরিশ্রম আর ক্রমাগত অনুশীলনের দ্বারা তিনি ধনুর্বিদ্যার প্রায় সকল প্রকার কলাকৌশল আয়ত্ত করে ফেললেন।

এ-সময়ে একদিন অস্ত্র গুরু দ্রোণাচার্য কুরু-পাণ্ডবদের নিয়ে তাঁদের অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষার পরীক্ষা নিতে গভীর বনে গেলেন। সেখানে ছাউনি ফেলে অবস্থান করছেন। তাঁদের সাথে একটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর ছিল। অপরিচিত কাউকে দেখলেই কুকুরটি উচ্চস্বরে যেউষেউ শব্দ করে চিৎকার করত।

কাকতালীয়ভাবে শিবিরের অল্প দূরেই ছিল একলব্যের সাধনার স্থান। একলব্য গভীর মনোনিবেশে অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষায় ব্যস্ত। এমন সময় কুকুরটি সেখানে এসে উচ্চস্বরে যেউষেউ করে চিৎকার করতে লাগল। একলব্যের সাধনা ভেঙে গেল। তিনি সাতটি বাণ নিক্ষেপ করে কুকুরটির মুখ বন্ধ করে দিলেন। সে-অবস্থায় কুকুরটি দ্রোণাচার্যের ছাউনিতে ফিরে গেল। তখন উপস্থিত সকলেই লক্ষ্য করলেন কুকুরটি আর শব্দ করছে না। যুধিষ্ঠির কুকুরটির মুখ পরীক্ষা করে দেখলেন কেউ বাণ নিক্ষেপ করে কুকুরটিকে স্তম্ভ করে দিয়েছে। তাঁরা সকলেই বিস্মিত হলেন। কুকুরটির পেছন পেছন তাঁরা পৌঁছে গেলেন একলব্যের কাছে এবং ফিরে এসে তাঁর কথা দ্রোণাচার্যকে জানালেন। দ্রোণাচার্যও বিস্মিত হলেন। তিনি চিন্তা করলেন, ধনুর্বিদ্যার এ-কৌশল তিনি ছাড়া আর কেউ জানেন না। অথচ কুকুরটিকে সেই কৌশলেই আক্রান্ত করা হয়েছে।



তিনি অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে ছাউনি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। একলব্যের কুটিরের সম্মুখে এসে দেখলেন, এক ব্যাধ যুবক একাগ্রমনে অধ্যবসায়ের সাথে তীর-ধনুক নিয়ে অনুশীলন করছেন। তাঁর সম্মুখে দ্রোণাচার্যের মাটির মূর্তি। দ্রোণাচার্যের উপস্থিতি টের পেয়ে একলব্য তাঁর তীর-ধনুক মাটিতে রেখে উঠে এলেন গুরু দ্রোণাচার্যের কাছে। তাঁকে সাফটাঙ্গো প্রণাম করে একলব্য বললেন, ‘গুরুদেব, আমি আপনার শিষ্য। আদেশ করুন, আমি আপনার জন্য কী করতে পারি।’

দ্রোণাচার্য তাঁকে বললেন, ‘বৎস, তুমি এ-বিদ্যা কোথা থেকে শিখেছ?’

একলব্য অশ্লান বদনে বললেন, ‘আমি আপনাকে মনে মনে গুরুপদে বরণ করে আপনার এই মূর্তি সামনে রেখে আপনার কাছ থেকেই এসকল কলাকৌশল শিক্ষা করেছি নিজের অধ্যবসায় আর নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে।’

দ্রোণাচার্য বিস্মিত হলেন। পাণ্ডবেরা বিস্মিত হয়ে মৌনমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন।

কোনো অস্ত্র গুরুর কাছে না শিখে নিজে নিজে গভীর অধ্যবসয়ে এমন অক্ল বিদ্যাশিক্ষা সহজ কথা নয়।

উপাখ্যানের শিক্ষা : অধ্যবসায় দ্বারা সাফল্য অর্জন করা যায়।

একক কাজ : অধ্যবসায়ের শিক্ষা তোমরা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে দেখাও।

নতুন শব্দ : একলব্য, দ্রোণাচার্য, হিরণ্যধনু, নিরলস, স্তম্ভ।

পাঠ ৭ : ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অধ্যবসায়ের গুরুত্ব

ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের জন্য অধ্যবসায় একটি অবিচ্ছেদ্য নৈতিক গুণ।

ব্যক্তিজীবনে অধ্যবসায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। অধ্যবসায় ছাড়া শিক্ষা আত্মস্থ হয় না। তাই চরিত্র গঠনে অধ্যবসায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

মানুষ সমাজবান্ধভাবে বাস করে। সমাজের প্রতি তার বেশ কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। সমাজের সকলেই যদি স্ব স্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে তাহলে সমাজে ও রাষ্ট্রে কোনো হানাহানি থাকবে না, থাকবে না কোনো বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি। কিন্তু মুখে বললেই নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা হয় না। এর জন্য চাই কাজের প্রতি একাগ্রতা, ধৈর্য, দায়িত্বশীলতা ও কর্তব্যপরায়ণ মনোভাব। আর এ-গুণাবলির সমন্বয়ে যে বিশেষ নৈতিক গুণ মানুষের মধ্যে জাগ্রত হয় তাকে বলে অধ্যবসায়। অধ্যবসায়ই মানুষকে উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে সাহায্য করে। অধ্যবসায়ের গুণেই মানুষ অনেক অসাধ্য সাধন করেছে। অধ্যবসায় ছাড়া কেউ কখনো উন্নতি করতে পারে না, কোনো জাতি তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না।

সভ্যতার শিখরে অধিষ্ঠিত আজকের বিশ্ব মানুষের সুদীর্ঘ দিনের অধ্যবসায়ের পরিণতি। বর্তমান সভ্যতার সগৌরব ইতিহাস নিরন্তর অধ্যবসায়ের ইতিহাস। মনীষীগণ সারা জীবন সাধনা করে মানবসভ্যতার উৎকর্ষ সাধন করেছেন। মানুষের অধ্যবসায় না থাকলে সভ্যতার অগ্রগতি হত না।

অধ্যবসায়ের যথার্থ কার্যকারিতার জন্যই জীবনের পথে সকল বাধা অতিক্রম করা মানুষের পক্ষে সম্ভবপর হয়েছে। মানুষের জীবনে যে চিরায়ত সংগ্রামী শক্তি নিহিত আছে, তার বহিঃপ্রকাশই হচ্ছে অধ্যবসায়। এই অধ্যবসায়ই মানুষকে করে তোলে সংগ্রামী, উদ্যোগী, আর কর্তব্যপরায়ণ। নিজের অসহায়ত্ব উপেক্ষা করে অধ্যবসায়ের প্রয়োগে মানুষ হয় স্বনির্ভর।

অধ্যবসায় একটি মহৎ গুণ। জাতীয় জীবন মর্যাদাবান হয়ে ওঠে অধ্যবসায়ের এই মহৎ গুণে। জাতির প্রতিটি মানুষ যদি প্রকৃত অধ্যবসায়ী হয়ে ওঠে তাহলে সে-জাতি অবশ্যই সুনাম ও গৌরবের অধিকারী হয়ে উঠবে।

যে-জাতি যত বেশি অধ্যবসায়ী সে-জাতি তত বেশি উন্নত। রাষ্ট্রীয় জীবনে গৌরব ও সাফল্য আনয়নের জন্য রাষ্ট্রের সকল নাগরিককে অধ্যবসায়ী হতে হয়। যেসকল রাষ্ট্রনায়ক, ধর্মসংস্কারক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, সমাজসংস্কারক জীবনে সাফল্য লাভ করেছেন তাঁরা সকলেই ছিলেন অধ্যবসায়ী।

শুধু নিজের জীবনে সাফল্য লাভ করলেই চলবে না। ব্যক্তিগত জীবনের সীমানা অতিক্রম করে জাতীয় জীবনকে মহিমাম্বিত করে তোলার জন্যও অনবরত সাধনা করে যেতে হবে। তাই সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় জীবনকে বিশ্বসভায় গৌরবজনক আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে আমাদের সকলকেই অধ্যবসায়ী হতে হবে। সুতরাং ব্যক্তিজীবনে, সমাজজীবনে ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অধ্যবসায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

দলীয় কাজ : ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অধ্যবসায়ের প্রভাব চিহ্নিত কর।

নতুন শব্দ : অবিচ্ছেদ্য, উৎকর্ষ, চিরায়ত, পরাধীনতা, ধর্মসংস্কারক, মহিমাম্বিত।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. জননী ও জন্মভূমি চেয়েও বড়।
২. আত্মকেন্দ্রিক মানুষ সাধারণত হয় না।
৩. কার্তবীর্যার্জুন একবার রাজধানীর বাইরে যাপন করছিলেন।
৪. অধ্যবসায় হচ্ছে কতিপয় সমষ্টি।
৫. একলব্যের ইচ্ছে হলো কাছ থেকে অস্ত্র বিদ্যা শেখার।

ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর :

| বাম পাশ | ডান পাশ |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| ১. স্বদেশের গৌরবে দেশপ্রেমিক মাত্রই | একই সূত্রে গাঁথা |
| ২. চন্দ্রবংশীয় এক রাজা | সভ্যতার অগ্রগতি হতো না |
| ৩. ছাত্রজীবন আর অধ্যবসায় | রাজ্য আক্রমণ করলেন |
| ৪. অধ্যবসায় না থাকলে | গর্ববোধ করে কার্তবীর্যার্জুন |

নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১. দেশপ্রেম কীভাবে প্রকাশ পায় ? দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা কর।
২. ‘দেশপ্রেম একটি মহৎ গুণ’ — ব্যাখ্যা কর।
৩. একলব্য কীভাবে ধনুর্বিদ্যা আয়ত্ত করলেন ? ব্যাখ্যা কর।
৪. একলব্যের উপাখ্যানটি পড়ে তুমি কী শিক্ষা পেলে ? ব্যাখ্যা কর।

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. কার্তবীর্যার্জুনের দেশপ্রেম মূল্যায়ন কর।
২. সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে দেশপ্রেমের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।
৩. ‘জীবনে সাফল্যলাভের মূলমন্ত্র অধ্যবসায়’ — উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।
৪. সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অধ্যবসায়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. রাবণ কোন মুনির নাতি ?

- | | |
|-----------|-------------|
| ক. কাশ্যপ | খ. পুলস্ত্য |
| গ. চ্যবন | ঘ. দুর্বাসা |

২. নিষাদদেবের রাজা ছিলেন কে ?

- | | |
|---------------|----------------|
| ক. হিরণ্যাক্ষ | খ. হিরণ্যকশিপু |
| গ. হিরণ্যধনু | ঘ. হিরণ্যমনু |

৩. দেশপ্রেম বলতে বোঝায় —

- মাতৃভূমির প্রতি মমত্ববোধ
- ব্যক্তিস্বার্থকে গুরুত্ব দেওয়া
- জাতির মঙ্গলের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

শ্যামল ১৯৭১ সনে অষ্টম শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। যখন ২৫শে মার্চ কালরাতে পাক হানাদার বাহিনী নিরপরাধ যুগ্ম মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং নির্বিচারে হত্যা করে তখন তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। কিন্তু স্বাধীন হওয়ার মাসখানেক পূর্বেই এক সম্মুখযুদ্ধে তিনি শহিদ হন।

৪. শ্যামলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কোন নৈতিক গুণটি ফুটে উঠেছে ?

- | | |
|-------------|--------------|
| ক. দয়া | খ. সততা |
| গ. দেশপ্রেম | ঘ. অধ্যবসায় |

৫. শ্যামলের আত্মত্যাগের মর্মার্থ হলো —

- স্বদেশকে ভালোবাসা
- মাতৃভূমির প্রতি মমত্ববোধ
- পরাজিততার গ্লানি থেকে মুক্তিলাভ

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

সুপ্রিয়া বারবার এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েও পাশ করতে না পেরে হতাশ হয়ে পড়ে। একদিন সে তার বান্ধবীর সাথে আলাপ প্রসঙ্গে তার হতাশার কথা ব্যক্ত করে। বান্ধবী তাকে পরামর্শের ছলে বলে, ‘একবার না পারিলে দেখ শতবার।’ কথাটি সুপ্রিয়ার মনে গভীর দাগ কাটে এবং সে সবকিছু ভুলে গূর্বোদ্যমে পড়ালেখা করতে থাকে। এ-বছর সে পরীক্ষায় পাশ করে। এ-সফলতায় তার জীবনের মোড় ঘুরে যায়।

ক. ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের কী বলা হয় ?

খ. মহামুনি পুলস্ত্য স্বর্গ থেকে নেমে এলেন কেন ? ব্যাখ্যা কর।

গ. বান্ধবীর পরামর্শ কেন সুপ্রিয়ার মনে গভীর দাগ কাটে তা তোমার পঠিত নৈতিক শিক্ষার আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সুপ্রিয়ার সাধনার প্রভাব পঠিত বিষয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর।

সপ্তম অধ্যায় আদর্শ জীবনচরিত

আমাদের সমাজে এমন কিছু মানুষ জন্মেছিলেন, যাঁরা আজীবন অন্যের উপকার করে গেছেন। নিজের কথা ভাবেননি। তাঁদের কোনো লোভ-মোহ ছিল না। পরোপকারই ছিল তাঁদের একমাত্র ভাবনা। জগতের কল্যাণ করাই ছিল তাঁদের জীবনের উদ্দেশ্য। তাঁরাই হলেন মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারী। তাঁদের জীবনীই হচ্ছে আদর্শ জীবনচরিত। তাঁদের জীবনী থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। আমাদের জীবন সুন্দরভাবে গড়তে পারি। আমরা ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে এমন বেশ কয়েকজন মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারী সম্পর্কে জেনেছি। এ-অধ্যায়ে আমরা শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, ঠাকুর নিগমানন্দ, ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, মা আনন্দময়ী, শ্রীল ভক্তিবিনোদস্বামী প্রভুপাদের জীবনী সম্পর্কে জানব এবং নৈতিকতা গঠনে তাঁদের শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করব।



এ-অধ্যায়শেষে আমরা —

- নৈতিকতা গঠনে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-পরবর্তীকালের জীবন ও শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- নৈতিকতা গঠনে শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের জীবন ও শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- নৈতিকতা গঠনে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনচরিতের আলোকে তাঁর শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- নৈতিকতা গঠনে ঠাকুর নিগমানন্দের জীবন ও শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- নৈতিকতা গঠনে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের জীবন ও শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- নৈতিকতা গঠনে মা আনন্দময়ীর জীবন ও শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- নৈতিকতা গঠনে শ্রীল ভক্তিবিনোদস্বামী প্রভুপাদের জীবন ও শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ ১, ২ ও ৩ : শ্রীকৃষ্ণ

আমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও শৈশবকালের কথা জেনেছি। সপ্তম শ্রেণিতে জেনেছি তাঁর বাল্যকালের কথা। এখন আমরা জানব তাঁর কৈশোর থেকে শুরু করে শেষ জীবন পর্যন্ত কর্মকাণ্ডের কথা।

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন :

ধর্মে গ্লানি, অধর্মে হয় যবে বাড়।
হেনকালে জন্ম মোর জান তত্ত্বসারা।
দুষ্টির বিনাশ আর সাধুর রক্ষণে।
যুগে যুগে জন্মি আমি ধর্মসংস্থাপনো (৪/৭-৮)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্রষ্টা ভগবান। পৃথিবীতে যখন ধর্মের গ্লানি দেখা দেয়, অধর্মের বৃদ্ধি ঘটে, তখন ধর্ম সংস্থাপনের জন্য এবং দুষ্টির দমন ও শিষ্টির পালনের জন্য তিনি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে এবং বাল্যকালে তিনি দুষ্টিদের দমন করেছেন এবং শিষ্টিদের রক্ষা করেছেন। সারা জীবনই তিনি একাজ করেছেন। আমরা এখন শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর থেকে পরবর্তী জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি এবং তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হব।



কংসবধ

কংস ছিলেন মথুরার রাজা। ভীষণ অত্যাচারী একজন মানুষ। নিজের পিতা উগ্রসেনকে বন্দি করে তিনি রাজ্য দখল করেন। কৃষ্ণ তাঁর হস্তা- এই দৈববাণী শুনে শিশুকাল থেকেই তিনি কৃষ্ণকে মারার বহু চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পারেননি। তাই বলে তিনি বসে ছিলেন না। একবার কৌশলে তাঁকে মারার পরিকল্পনা করলেন। মল্লযুদ্ধে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য তিনি অক্রুরকে পাঠালেন কৃষ্ণের কাছে। কৃষ্ণ-বলরাম তখন বৃন্দাবনে। অক্রুর গিয়ে কংসের দুরভিসন্ধির কথা বলে দিলেন। কৃষ্ণ ও বলরাম মথুরায় এলেন। তাঁদের হাতে অনেক যোদ্ধা মারা গেল। তা দেখে কংস ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন। তিনি কৃষ্ণকে মারার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে আসামাত্রই কৃষ্ণ লাফ দিয়ে তাঁর রথে উঠলেন। চুল ধরে মাটিতে ফেলে কংসকে হত্যা করেন। তারপর উগ্রসেন, দেবকী, বসুদেব প্রমুখকে মুক্ত করেন। উগ্রসেনকে মথুরার রাজা করেন। মা-বাবার সঙ্গে কৃষ্ণ, বলরাম ও মথুরায় থেকে যান। মথুরায় শান্তি ফিরে আসে।

জরাসন্ধ বধ

জরাসন্ধ ছিলেন মগধের রাজা এবং কংসের শ্বশুর। তিনিও ভীষণ অত্যাচারী ছিলেন। কংসের মৃত্যুর খবর শুনে তিনি ভীষণ রেগে যান। বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে তিনি মথুরা আক্রমণ করেন। কিন্তু কৃষ্ণের হাতে তাঁর পরাজয় ঘটে। কৃষ্ণ তাঁকে ক্ষমা করে দেন। এতে জরাসন্ধ লজ্জিত হন বটে, কিন্তু তাঁর প্রতিশোধ স্পৃহা বেড়ে যায়। তাই কৃষ্ণকে মারার জন্য তিনি পরপর সাতবার মথুরা আক্রমণ করেন। কৃষ্ণ তার পরও তাঁকে মারেননি। কিন্তু তিনি এক বিরাট অন্যায় কাজ করতে যাচ্ছিলেন। রুদ্রদেবের পূজার জন্য তিনি একশো নরবলি দেবেন বলে স্থির করেছিলেন। এ-উদ্দেশ্যে তিনি ৮৬ জন রাজাকে বন্দি করে রেখেছিলেন। আর ১৪ জন হলেই তিনি তাঁর অভীষ্ট কাজ সম্পন্ন করবেন। এ-খবর কৃষ্ণ জানতে পেরে দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমের সাহায্যে তাঁকে বধ করেন। ফলে একশো জন রাজার প্রাণ বেঁচে যায়।

শিশুপাল বধ

শিশুপাল ছিলেন চৈদিরাজ্যের রাজা। কৃষ্ণের আত্মীয়। পিসতুতো ভাই। কিন্তু ভীষণ অত্যাচারী। তাই শিশুপালের মা কৃষ্ণকে অনুরোধ করে বলেছিলেন — বাবা, তুমি ওর একশটি অপরাধ ক্ষমা করো। কৃষ্ণ তা করেছিলেন। গুরুজনের কথা রেখেছিলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে কৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নির্বাচিত হওয়ায় ঈর্ষান্বিত শিশুপাল তাঁর নিন্দা শুরু করেন। পাণ্ডবদেরও গালমন্দ করেন। যুদ্ধের হুমকি দেন। কৃষ্ণ তখন তাঁর সুদর্শন চক্র দ্বারা তাঁকে হত্যা করেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা

ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু দুই ভাই। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ব। তাই ছোট ভাই পাণ্ডু হস্তি নাপুরের রাজা হন। পাণ্ডুর পাঁচ ছেলে। যুধিষ্ঠির বড়। তাঁদের বলা হয় পাণ্ডব। ধৃতরাষ্ট্রের একশত ছেলে। বড় দুর্যোধন। তাঁদের বলা হয় কৌরব। কৌরবরা ছিলেন অসৎ এবং দুরাচার। আর পাণ্ডবরা ছিলেন সৎ ও সদাচারী।

পাণ্ডুর মৃত্যুর পর যুধিষ্ঠিরের রাজ্য হওয়ার কথা। কিন্তু দুর্যোধন তা মানলেন না। তাই ধৃতরাষ্ট্র দুই পক্ষের মধ্যে রাজ্য ভাগ করে দিলেন। পাণ্ডবদের রাজধানী হলো ইন্দ্রপ্রস্থ। কিন্তু দুর্যোধন তাতে খুশি নন। তাঁর পুরো রাজ্যটাই চাই। তাই তিনি একদিন যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলায় আহ্বান করেন। মনে তাঁর দুরভিসন্ধি। কপট পাশা খেলায় যুধিষ্ঠির হেরে যান। খেলার শর্ত অনুযায়ী পাণ্ডবরা তেরো বছরের জন্য বনে যান। বনবাসশেষে ফিরে এসে রাজ্য দাবি করেন। কিন্তু দুর্যোধন বললেন, বিনা যুদ্ধে তিনি রাজ্য দেবেন না। কৃষ্ণ তখন যুদ্ধ ঠেকানোর জন্য দুর্যোধনের কাছে যান। অনেক আলোচনা করেন। কিন্তু দুর্যোধন কোনো কথাই শুনলেন না। অগত্যা কুরুক্ষেত্র নামক স্থানে দুই পক্ষের তুমুল যুদ্ধ হয়। কৃষ্ণ পাণ্ডবদের পক্ষে ছিলেন। যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ লোক নিহত হয়। কৌরবদের সবাই নিহত হন। যুদ্ধশেষে যুধিষ্ঠির রাজা হন এবং রাজ্যে শান্তি ফিরে আসে।



অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দুই পক্ষ মুখোমুখি। কৃষ্ণ অর্জুনের রথের সারথি। তখনও যুদ্ধ শুরু হয়নি। অর্জুন বিপক্ষে আত্মীয়-স্বজনদের দেখে কৃষ্ণকে বললেন যুদ্ধ করবেন না। আত্মীয়দের হত্যা করে তিনি রাজ্য চান না। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বললেন, ‘তুমি ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম যুদ্ধ করা। তা না হলে তার অধর্ম হয়। অপযশ হয়। তা ছাড়া আত্মার মৃত্যু নেই। দেহান্তর ঘটে মাত্র। তুমি যাদের দেখে মায়া করছ, তারা নিজেদের দোষে মৃত্যুকে বরণ করে আছে। তুমি উপলক্ষ মাত্র। কাজেই যুদ্ধ করে তুমি তোমার কর্তব্য পালন কর। যার যা কর্তব্য তা পালন করা ধর্মের অঙ্গ।’ কৃষ্ণ একথা বলার পর অর্জুনের মোহভঞ্জন হয় এবং তিনি যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে অন্যায়ের পরাজয় ঘটে, ন্যায়ের জয় হয়। এভাবে শ্রীকৃষ্ণ বারবার দুর্ষকে দমন করে শিষ্ণের পালন করেছেন এবং সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছেন।

দলীয় কাজ : দুর্ষের দমনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবদান লিখে একটি তালিকা তৈরি কর।

শ্রীকৃষ্ণের বন্ধু বাৎসল্য

শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন খুবই বন্ধুবৎসল। সুদামা নামে তাঁর এক সহপাঠী ছিলেন। একই গুরুর নিকট তাঁরা পড়াশোনা করেছেন। সুদামা খুবই গরিব। তবে ব্রহ্মবিদ। তাঁর কোনো লোভ-লালসা নেই। অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণ এখন দ্বারকার রাজা। তদুপরি স্বয়ং ভগবান হিসেবে তাঁর খ্যাতি সর্বত্র।

একদিন সুদামার স্ত্রী তাঁকে বললেন, ‘তোমার বন্ধু কৃষ্ণ দ্বারকার রাজা। তাঁর কাছে গেলে হয়তো কিছু অর্থসাহায্য পাওয়া যেত। তাতে আমাদের অভাব অনেকটা ঘুচত।’ সুদামা অর্থের লোভে নয়, অনেক দিন পরে বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবে এই ভেবে যেতে রাজি হলেন। তিনি একদিন সত্যি সত্যিই দ্বারকায় রওনা হলেন। যাওয়ার সময় তাঁর স্ত্রী কৃষ্ণকে উপহার দেওয়ার জন্য কিছু চিড়ার খুদ সুদামার উত্তরীয় বস্ত্রে বেঁধে দিলেন।

সুদামা দ্বারকায় পৌঁছলেন। তাঁকে দেখামাত্র কৃষ্ণ দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরলেন। কৃষ্ণের স্ত্রী রুক্মিণী তাঁকে বিশেষভাবে আদর-আপ্যায়ন করলেন। কিছুক্ষণ পর শ্রীকৃষ্ণ বললেন, ‘বন্ধু, আমার জন্য কী এনেছ?’ সুদামা তখন সেই চিড়ার খুদ বের করে দিলেন। কৃষ্ণ পরম তৃপ্তিভরে খেলেন। তারপর তাঁরা অনেকক্ষণ গল্প করলেন। কিন্তু সুদামা একবারও অর্থের কথা বললেন না। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বন্ধুর বৈশিষ্ট্য দেখে সবই বুঝতে পারলেন। তাই তিনি ঐশীবলে সুদামার বাড়ির অবস্থা পরিবর্তন করে দিলেন। সুদামা ফিরে গিয়ে দেখেন তাঁর কুঁড়েঘরের জায়গায় বিশাল অটালিকা। ঘরে ধনসম্পদের অভাব নেই। কিন্তু তিনি আগের মতোই সাধারণ জীবনযাপন করতেন এবং ব্রহ্মের উপাসনা করতেন।

একক কাজ : তোমার জন্য বন্ধু প্রীতির কোনো ঘটনা সম্পর্কে লেখ।

শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান

ভগবান যে-উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ অবতাররূপে জন্ম নিয়েছিলেন, তা সম্পন্ন হয়েছে। দুর্ষদের দমন করা হয়েছে। সমাজে ধর্ম ও শান্তি পুনঃস্থাপিত হয়েছে। তাই এবার তাঁর বৈকুণ্ঠে যাবার পালা। বলরাম ইতোমধ্যে ধ্যানযোগে দেহত্যাগ করেছেন।

কৃষ্ণ তাই বনে প্রবেশ করে একটি অশ্বখ বৃক্ষের নিচে বসে আছেন। দূর থেকে জরা নামে এক ব্যাধ তাঁকে হরিণ মনে করে শর নিক্ষেপ করে। শরটি কৃষ্ণের পায়ে লাগে। এই শরাঘাতেই কৃষ্ণ ইহলীলা সংবরণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণের জীবনী থেকে আমরা এই নৈতিক শিক্ষা পাই যে, অন্যায় ও অসত্য এক সময় পরাজিত হয়ই। সমাজে দুষ্কর্মেদের ঠাই নেই। ভগবানও তাদের ক্ষমা করেন না। ভগবান ধনী-গরিব সকলকেই সমানভাবে ভালোবাসেন। যার যা কর্তব্য তা করা ধর্মের অঙ্গ। অতএব, আমরা এই শিক্ষাগুলো আমাদের জীবনে কাজে লাগাব।

নতুন শব্দ : গ্লানি, অত্র, সূহা, অতীর্ষ, রাজসূয়, ইন্দ্রপ্রস্থ, ঐশীবল, অন্তর্ধান।

পাঠ ৪ ও ৫ : শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর

গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলার অন্তর্গত সাফলিডাঙ্গা একটি গ্রাম। এই গ্রামেই জনগ্রহণ করেন হরিচাঁদ ঠাকুর। বাংলা ১২১৮ সনের (১৮১১ খ্রিষ্টাব্দ) ফাল্গুন মাসে। সেদিন ছিল কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথি। হরিচাঁদ ঠাকুরের পিতার নাম যশোমন্ত ঠাকুর এবং মাতা অন্নপূর্ণা দেবী। যশোমন্ত ছিলেন মৈথিলী ব্রাহ্মণ এবং নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। হরিচাঁদ যশোমন্তের দ্বিতীয় পুত্র। তাঁর অপর তিন পুত্রের নাম যথাক্রমে বৈষ্ণবদাস, গৌরীদাস ও স্বরূপদাস। এঁরা সবাই ছিলেন বৈষ্ণব। হরিচাঁদ ছিলেন খুবই মেধাবী। কিন্তু বিদ্যালয়ের গভীরবন্দ্য পাঠ তাঁর ভালো লাগেনি। তাই মাত্র কয়েক মাস গিয়ে তিনি বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। মিশে যান রাখাল কব্জীদের সঙ্গে। তাদের সঙ্গে গোচারণ করেন। খেলাধুলা করেন। কখনো- বা গান করেন। তাঁর গানের গলা ছিল খুবই মধুর। তাই তাঁর গান, ভজন, কীর্তন শুনে সবাই মুগ্ধ হয়ে যেত। তাঁর চেহারাও ছিল খুবই সুন্দর। ব্যবহার ছিল অমায়িক। এসব কারণে সবাই তাঁকে পছন্দ করত। রাখাল কব্জীরা তাঁকে বলত ‘রাখাল রাজা’।

হরিচাঁদ ঠাকুর ছোটবেলা থেকেই ছিলেন ভাবুক প্রকৃতির। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এ-বিষয়টি তাঁর মধ্যে আরও প্রকট হয়। তিনি ক্রমশ ধর্মের দিকে চলে যান। তবে তিনি নতুন কোনো ধর্মমত প্রচার করেননি। তিনি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের হরিনাম প্রচার করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘ভক্তির সঙ্গে হরির নাম নিলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে।’ এই নামসংকীর্তনই হচ্ছে তাঁর সাধন-ভজনের পথ। তিনি এই হরিনামে মাতোয়ারা হয়ে যেতেন। এজন্য তাঁর এই সাধনপথের নাম হয় মতুয়া। আর তাঁর অনুসারীদের বলা হয় ‘মতুয়া সম্প্রদায়’।



মতুয়াবাদের মূল কথা হলো মনুষ্যত্ব অর্জন, আত্মোন্নতি এবং সার্বিক কল্যাণসাধন। সত্য, প্রেম ও পবিত্রতা — এই তিনটি

স্তম্ভের উপর মতুয়াবাদ প্রতিষ্ঠিত। সাধনার লক্ষ্য সত্যদর্শন বা ঈশ্বরলাভ। এজন্য চাই প্রেম। প্রেমের পূর্বশর্ত হচ্ছে পবিত্রতা। পবিত্র দেহ-মনে প্রেমের উদয় হয়। তখন ভক্তের অন্তরে প্রেমময় হরি জাগ্রত হন।

হরিচাঁদ ঠাকুর হরিনামের মাধ্যমে সামাজিকভাবে অবহেলিত সম্প্রদায়কে একতাবদ্ধ করেন। তিনি বলতেন, ‘দল নাই যার, বল নাই তার।’ এর ফলে মতুয়াবাদ এক বিরাট আন্দোলনে পরিণত হয় এবং মতুয়া সম্প্রদায় ছড়িয়ে পড়ে বাংলার সর্বত্র।

ঠাকুর বলতেন, ধর্মচর্চার জন্য সংসার ত্যাগ করতে হয় না। সংসারে থেকে সংসারের কাজ করেও ধর্মচর্চা করা যায়। তাঁর নির্দেশই ছিল, ‘হাতে কাম, মুখে নাম।’ তিনি নিজেও সংসারী ছিলেন। তাঁর দুই পুত্র ও তিন কন্যা ছিলেন। পুত্ররা হলেন গুরুচরণ ও উমাচরণ। ঠাকুরের অন্তর্ধানের পর গুরুচরণই গুরুচাঁদ নামে মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রধানরূপে পূজিত হন। মতুয়া সম্প্রদায় হরিচাঁদ ঠাকুরকে বিষ্ণুর অবতার হিসেবে জ্ঞান করেন। তাই তাঁরা বলেন:

রাম হরি কৃষ্ণ হরি হরি গৌরচাঁদ।

সর্ব হরি মিলে এই পূর্ণ হরিচাঁদ ॥

ঠাকুরের মতুয়াবাদে নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, ধর্ম-বর্ণ এসবে কোনো ভেদ নেই। যে-কেউ হরিনাম সংকীর্তনে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

মতুয়া সম্প্রদায়ের মূল কেন্দ্র গোপালগঞ্জের ওড়াকান্দিতে। সাফলিভাঙ্গা গ্রামের পাশে। সেখানে প্রধান হরিমন্দির অবস্থিত। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে হরিমন্দির আছে। প্রতিবছর চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের মধুকৃষ্ণ ত্রয়োদশী তিথিতে ওড়াকান্দিতে মহাবারুণি স্নান অনুষ্ঠিত হয়। তিন দিন পর্যন্ত মেলা বসে। হাজার হাজার লোকের সমাগম ঘটে ঐ স্নান ও মেলায়। তাঁরা হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদ ঠাকুরকে গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

বাংলা ১২৮৪ সনের (১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দ) ২৩শে ফাল্গুন ৬৬ বছর বয়সে হরিচাঁদ ঠাকুর ইহলীলা সংবরণ করেন।

ঠাকুরের জীবন ও আদর্শ নিয়ে কবিয়াল তারকচন্দ্র সরকার রচনা করেছেন ‘শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত’ গ্রন্থ।

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে হরিমন্দির আছে। সেখানে মতুয়াসহ ভক্তরা নিয়মিত নামকীর্তন করেন এবং হরিচাঁদ ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

ঠাকুরের কয়েকটি মূল্যবান বাণী হলো:

১. হরি ধ্যান হরি জ্ঞান হরি নাম সার।

প্রেমেতে মাতোয়ারা মতুয়া নাম যার॥

২. জীবে দয়া নামে রুচি মানুষেতে নিষ্ঠা।

ইহা ছাড়া আর যত সব ক্রিয়া ভ্রষ্টা॥

৩. গৃহেতে থাকিয়া যার হয় ভাবোদয়।
সেই যে পরম সাধু জানিও নিশ্চয়।
৪. গৃহকর্ম গৃহধর্ম করিবে সকল।
হাতে কাম মুখে নাম ভক্তিই প্রবল।
গার্হস্থ্য তোমার ধর্ম অতি সনাতন।
দুষ্টির দমন আর শিষ্যের পালনা।

হরিচাঁদ ঠাকুর তাঁর অনুসারীদের বারোটি উপদেশ দিয়েছেন, যেগুলো 'দ্বাদশ আজ্ঞা' নামে পরিচিত। এই আজ্ঞাগুলো সবার জন্যই শিক্ষণীয়। আজ্ঞাগুলো হলো : (১) সদা সত্য কথা বলবে। (২) পিতা-মাতাকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করবে। (৩) নারীকে মাতৃজ্ঞান করবে। (৪) জগৎকে প্রেম করবে। (৫) সকল ধর্মে উদার থাকবে। (৬) জাতিভেদ করবে না। (৭) হরিমন্দির প্রতিষ্ঠা করবে। (৮) প্রত্যহ প্রার্থনা করবে। (৯) ঈশ্বরে আত্মদান করবে। (১০) বহিরঞ্জে সাধু সাজবে না। (১১) ষড়রিপু বশে রাখবে। (১২) হাতে কাম, মুখে নাম করবে।

দলীয় কাজ : হরিচাঁদ ঠাকুরের উপদেশগুলো লিখে একটি পোস্টার তৈরি কর।

নতুন শব্দ : আত্মানুতি, মতুয়া, মহাবাহুণি, বহিরঞ্জে, ষড়রিপু।

পাঠ ৬, ৭ ও ৮ : স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দের ১২ জানুয়ারি কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বিশ্বনাথ দত্ত এবং মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের একজন নামকরা উকিল। বিবেকানন্দের প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি দীর্ঘজীবী ছিলেন না। মাত্র ৩৯ বছর ৫ মাস ২৩ দিন তিনি বেঁচেছিলেন। এই অল্প সময়ে মানবজাতির কল্যাণের জন্য তিনি যে-অবদান রেখে গেছেন, তা অসাধারণ। চিরদিন মানুষ তাঁর এই অবদানের কথা স্মরণ করবে।

নরেন্দ্রনাথ খুব মেধাবী ছিলেন। স্কুল-কলেজের পরীক্ষায় ভালো ফল করেছেন। তিন বিএ-ও পাশ করেছেন। আইন ও দর্শন বিষয়ে তাঁর ছিল অগাধ জ্ঞান।



এ-সময়ে নরেন্দ্রনাথের মনে এক পরিবর্তন দেখা দেয়। তিনি কেবল ঈশ্বর সম্পর্কে চিন্তা করেন। ঈশ্বর কি আছেন? তাঁকে কি দেখা যায়? এ-ধরনের প্রশ্ন প্রায়ই তাঁর মনে জাগে। তিনি অনেককে এ-প্রশ্ন জিজ্ঞেসও করেছেন। কিন্তু কারো উত্তরে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। এমন সময় একদিন তাঁর দেখা হয় কালীর সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে। রামকৃষ্ণ

তখন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে থাকেন। নরেন্দ্রনাথ একদিন চলে যান সেখানে। রামকৃষ্ণকে তিনি জিজ্ঞেস করেন, ‘আপনি কি ঈশ্বর দেখেছেন?’ রামকৃষ্ণ হাসতে হাসতে বলেন, ‘হ্যাঁ, দেখেছি; যেমন তোকে দেখছি। চাইলে তোকেও দেখাতে পারি।’

এই সাদাসিধে সাধক শ্রীরামকৃষ্ণকে নরেন্দ্রনাথের ভালো লাগে। তাঁর প্রতি কেমন যেন একটা ভক্তির ভাব জেগে ওঠে। তাই তিনি নিয়মিত দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু করেন। একসময় শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা নেন। নরেন্দ্রনাথ হন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী। তখন তাঁর নাম হয় বিবেকানন্দ। পরবর্তীকালে ভক্তরা তাঁকে স্বামী বিবেকানন্দ বা শুধু স্বামীজী বলেই ডাকতেন।

বিবেকানন্দ গৃহত্যাগ করেছেন বটে, কিন্তু ভারতবর্ষ এবং তার মানুষকে ত্যাগ করেননি। তিনি নিজের চোখে দেখতে চাইলেন ভারতবর্ষের মানুষের অবস্থা। তিনি সারা ভারতবর্ষ ঘুরলেন। অনেকের সঙ্গে কথা বললেন। লোকের বাড়ি বাড়ি গেলেন। দেখলেন, সারা দেশে কেবল দারিদ্র্য আর দারিদ্র্য। কেবল অশিক্ষা আর কুশিক্ষা। দেশবাসীর এই হীন অবস্থা দেখে তিনি খুব কষ্ট পেলেন। তিনি এই অশিক্ষা, কুশিক্ষা আর দারিদ্র্যের কারণ জানতে চাইলেন। কীভাবে এসব থেকে দেশবাসীকে উদ্ধার করা যায়, সে-কথাও চিন্তা করতে লাগলেন। ভারতের শেষ শিলাখণ্ডে বসে তিনি ধ্যানস্থ হলেন। ধ্যানের মাধ্যমে তিনি বুঝতে পারলেন যে, ভারতের জীবনীশক্তির উৎস হচ্ছে ধর্ম। এই ধর্ম হচ্ছে দেবতাজ্ঞানে মানুষের সেবা। এই ধর্মমন্ত্রে ভারতবাসীকে জাগিয়ে তুলতে হবে। তবেই ভারতের উন্নতি হবে।

১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে বিবেকানন্দ আমেরিকা যান। সেখানে শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম সম্মেলনে তিনি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার শুরুতে তিনি উপস্থিত সকলকে ‘ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ’ বলে সম্বোধন করেন। অন্যরা করেছেন প্রথাগতভাবে ‘ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ’ বলে। কিন্তু বিবেকানন্দের মুখে এই নতুন সম্বোধন শুনে উপস্থিত সকলে মুগ্ধ হন। অজানা অচেনা লোকদের এভাবে ভাই-বোন বলে আপন করে নেওয়ার মানসিকতা দেখে তাঁরা বিস্মিত হন। তারপর বিবেকানন্দ তাঁর বক্তৃতায় বলেন, ‘হিন্দুধর্ম পৃথিবীর সকল ধর্মকে সমান সত্য মনে করে। সব ধর্মের লক্ষ্যই এক। নদীসমূহ যেমন এক সাগরে গিয়ে মিলিত হয়, তেমনি সকল ধর্মেরই লক্ষ্য এক—ঈশ্বরলাভ। তাই বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।’ বিবেকানন্দের এই বক্তৃতায় সবাই অত্যন্ত খুশি হন। ধর্মসভার বিচারে তিনি হন শ্রেষ্ঠ বক্তা। তখন তাঁর বয়স মাত্র ত্রিশ বছর আট মাস।

ধর্মসভায় বক্তৃতার পর সারা আমেরিকায় বিবেকানন্দের নাম ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন জায়গা থেকে আমন্ত্রণ আসে বক্তৃতার জন্য। তিনিও হিন্দু ধর্ম-দর্শন, বিশেষত বেদান্তদর্শন সম্পর্কে একের পর এক বক্তৃতা দিয়ে আমেরিকা জয় করেন। তারপর যান ইউরোপ। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি দেশ ঘুরে বেড়ান এবং বক্তৃতা দেন। তিনি বেদান্তদর্শনের প্রকৃত সত্য তুলে ধরেন। তিনি বক্তৃতার মাধ্যমে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করেন যে, হিন্দুধর্ম কেবল মূর্তির পূজা করে না, সকল দেবতার পূজার মধ্য দিয়ে এক ঈশ্বরেরই আরাধনা করে। তাঁর বক্তৃতা থেকে পাশ্চাত্যের মানুষ হিন্দু ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে নতুন করে জানতে পারেন। অনেকে তাঁর পরম ভক্ত হয়ে যান। তাঁদের মধ্যে মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বিবেকানন্দের আদর্শে এতটাই উদ্বুদ্ধ হন যে, নিজের জন্মভূমি আয়ারল্যান্ড ছেড়ে ভারতবর্ষে চলে আসেন। বিবেকানন্দের কাছে তিনি দীক্ষা নেন। তখন তাঁর নাম হয় ভগিনী নিবেদিতা।

প্রায় চার বছর পৃথিবী ভ্রমণ করে বিবেকানন্দ ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে দেশে ফেরেন। দেশের মানুষ তাঁকে মহা সমাদরে গ্রহণ করে। বিশাল সংবর্ধনা দেয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি দেশের মানুষকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইতে বলেন। সমস্ত কুসংস্কার পরিত্যাগ করতে বলেন। সবাইকে বিভেদ ভুলে এক হতে বলেন। তিনি বলেন, শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম।

দুর্বলতা ও কাপুরুষতাই পাপ। স্বাধীনতাই ধর্ম, পরাধীনতাই পাপ।

বিবেকানন্দ বলতেন, সত্যি সকল ধর্মের ভিত্তি। পরোপকারই ধর্ম, পরপীড়নই পাপ। সৎ হওয়া আর সৎ কর্ম করা ধর্মের অঙ্গ। নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর সকলেই আমাদের ভাই। এদের সেবাই পরম ধর্ম। আত্মবিশ্বাস ও ঈশ্বরে বিশ্বাস— এ-দুটি জিনিসই উন্নতিলাভের একমাত্র উপায়।

বিবেকানন্দ যুবকদের আগে শরীর গঠন করতে বলতেন। তারপর ধর্মচর্চা। কারণ দুর্বল শরীরে ধর্মচর্চা হয় না। কোনো কাজই হয় না। এজন্য তাদের গীতা পড়ার আগে ফুটবল খেলতে হবে। তাতে শরীর গঠিত হবে। তখন গীতা আরও ভালো বোঝা যাবে।

বিবেকানন্দের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো— খালিপেটে ধর্ম হয় না। তাই সবার আগে মানুষের দারিদ্র্য ঘোচাতে হবে। ঈশ্বরসেবার আগে তাঁর সৃষ্ট জীবের সেবা করতে হবে। জীবসেবা করলেই ঈশ্বরসেবা হবে। তাই তিনি জোর দিয়ে বলেছেন :

বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?

জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ॥

বিবেকানন্দের কাছে উঁচু-নিচু কোনো ভেদাভেদ ছিল না। অস্পৃশ্যতাকে তিনি ঘৃণা করতেন। একবার এক পতিতা গিয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে মাতৃদর্শনে। এতে কয়েকজন ভদ্রলোক আপত্তি তোলেন। একজন শিষ্য একথা বিবেকানন্দকে জানান। তিনি বলেন, মাতৃদর্শনে সকলেরই অধিকার আছে। বরং পতিতাদেরই বেশি আসা দরকার। উন্মাদার পাবার জন্য। এতে যদি কারো আপত্তি থাকে তাহলে তিনি এখানে না আসতে পারেন।

বিবেকানন্দ তাঁর গুরুদেব রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আদর্শ প্রচারের জন্য একটি মঠ স্থাপন করেন। রামকৃষ্ণ মঠ। পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার বেলুড়ে গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে এটি অবস্থিত। সাধারণভাবে এটি বেলুড় মঠ নামে পরিচিত।

গুরুদেবের আদর্শ প্রচারের জন্য বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনও প্রতিষ্ঠা করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা রয়েছে। এসবের প্রধান কেন্দ্র বেলুড় মঠ। বাংলাদেশে যেসব মঠ ও মিশন রয়েছে, সেসবের প্রধান কেন্দ্র ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশন। পৃথিবীব্যাপী এই মঠ ও মিশনের মাধ্যমে শতশত মানুষকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সেবার মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, চিকিৎসা, আপৎকালীন সাহায্যপ্রদান ইত্যাদি।

বিবেকানন্দের সেবাধর্মে কোনো জাতিভেদ বা ধর্মভেদ ছিল না। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে তিনি সেবা প্রদান করতেন। একবার কলকাতায় প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। তখন রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। সেখানে কয়েকজন মুসলমান বালক এসেছিল থাকার জন্য। এদের কী করা হবে জানতে চাইলে বিবেকানন্দ বলেছিলেন, মুসলমান বালকেরা অবশ্যই থাকবে। শুধু তা-ই নয়, তাদের খাওয়াদাওয়া এবং ধর্মচর্চায় যাতে কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়, সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে।

বিবেকানন্দ কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন। কাজ ছাড়া তিনি কিছুই বুঝতেন না। তাই বিশ্বাসের অভাবে অল্পদিনেই তাঁর শরীর ভেঙে পড়ে। ফলে ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দের ৪ জুলাই বেলেড় মঠে তিনি দেহত্যাগ করেন।

বিবেকানন্দের জীবনী থেকে আমরা এই নীতিশিক্ষা পাই যে, পৃথিবীর সকল মানুষ এক জাতি। ধর্ম তাদের পৃথক পৃথক হতে পারে। তবে সব ধর্মেরই ভিত্তি এক এবং তা হলো সত্য। সত্যই ধর্ম। জীবসেবা মানেই ঈশ্বরসেবা। মানুষকে ধর্মের কথা বলার আগে তার দারিদ্র্য মোচন করতে হবে। কারণ খালিপেটে কেউ ধর্মের কথা শুনতে চায় না। ধনী-দরিদ্র, মুচি-মেথরে কোনো পার্থক্য নেই। সবাই ভাই-ভাই। কোনো মানুষই অস্পৃশ্য নয়, পেশা তার যা-ই হোক। আত্মবিশ্বাস ও ঈশ্বরে বিশ্বাস উন্নতির প্রথম শর্ত। ধর্মচর্চার আগে শরীর সুস্থ ও বলবান রাখতে হবে। কারণ দুর্বল শরীরে শুধু ধর্ম নয়, কোনো কাজই ঠিকমতো হয় না। বিবেকানন্দের এই শিক্ষা আমরা অনুসরণ করব। তাহলে আমরাও জীবনে সফল হতে পারব।

একক কাজ : তোমার জানা জীবসেবামূলক বাস্তব ঘটনা সম্পর্কে লেখ।

নতুন শব্দ : অস্পৃশ্যতা, আপৎকালীন।

পাঠ ৯, ১০ ও ১১ : ঠাকুর নিগমানন্দ

মেহেরপুর জেলার অন্তর্গত কুতুবপুর একটি গ্রাম। সেই গ্রামে বাস করতেন ভুবনমোহন ভট্টাচার্য নামে একজন সদাচারী ব্রাহ্মণ। তাঁর স্ত্রীর নাম মানিক সুন্দরী। উভয়েই নিয়মিত পূজা-পার্বণ ও ব্রতচার নিয়ে থাকতেন। মানিক সুন্দরীর পিত্রালয় মেহেরপুরেই অন্তর্গত রাধাকান্তপুর গ্রামে। এই গ্রামেই ১২৮৭ সালের (১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দ) বুলন পূর্ণিমার রাতে বৃহস্পতিবার মাতুলালয়ে ঠাকুর নিগমানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর চোখদুটি ছিল পদ্ম বা নলিনীর মতো দেখতে। তাই তাঁর নাম রাখা হয় নলিনীকান্ত। নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য।



নলিনীর বয়স তখন সাত বছর। পিতা ভুবনমোহন ছেলেকে ভর্তি করিয়ে দেন গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। খেলধুলা ও দুরন্তপনার পাশাপাশি নলিনী পড়াশোনায়ও মেধার পরিচয় দিয়ে আসছিলেন শুরু থেকেই। তাই প্রাথমিকের পাঠ তিনি সাফল্যের সঙ্গেই শেষ করেন। এরপর তিনি ভর্তি হন দারিয়াপুর গ্রামের মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে। থাকতেন রাধাকান্তপুরে মাতুলালয়ে।

একাদশ বছর বয়সে নলিনীর উপনয়ন হয়। তখন থেকেই তাঁর মধ্যে ধর্মভাব জেগে ওঠে। তিনি ত্রিশম্ভা গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতেন। নিয়মিত রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি পাঠ করতেন। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। তিনি জাতিভেদ মানেন না। ব্রাহ্মণের মিথ্যা অহংকারকে ঘৃণা করেন। তবে প্রকৃত সম্মানিত

ব্যক্তিকে সম্মান করেন। যুক্তি দিয়ে তিনি নিজের মতকে সমর্থন করেন। কিন্তু নিজের মত ঠিক নয় বুঝতে পারলে তিনি নির্দিষ্ট পরাজয় স্বীকার করেন। ধর্মের নামে ভক্তিমিকে তিনি তীব্রভাবে ঘৃণা করেন।

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সম্পর্কে নলিনীর দাদামশাই। তিনি নলিনীকে খুব স্নেহ করতেন। নলিনীও তাঁকে খুব ভালোবাসতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন। দুজনের মধ্যে অনেক বিষয়ে কথা হতো। এর মধ্য দিয়ে নলিনী বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট থেকে অনেক কিছু শিখেছিলেন। নলিনীর ইংরেজি পরীক্ষার আগেই বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হয়। কিছুদিন পর মা মানিক সুন্দরীও পরলোক গমন করেন। এ-দুটি ঘটনা নলিনীর মনে গভীর রেখাপাত করে। মানব জীবনের নশ্বরতা তাঁকে ভীষণভাবে ভাবিয়ে তোলে।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর নলিনীর মধ্যে বিরাট পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। দেব-দ্বিজে, ধর্মে-কর্মে, শাস্ত্রাদিতে তাঁর বিশ্বাস উঠে যায়। ভগবানে বিশ্বাস নেই। ঝোঁক দেখা দেয় যাত্রা-থিয়েটার ও সাহিত্যচর্চায়। পাশাপাশি চলে জনসেবার কাজ। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের বাড়ি গিয়ে রোগীর সেবা করেন। কোনো বাড়িতে মৃতদেহ সংস্কারে লোক পাওয়া না গেলে নলিনী সেখানে সাগ্রহে এগিয়ে যান। এ নিয়ে পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছ থেকে পিতা ভুবনমোহনকে অনেক নিন্দাবাক্য শুনতে হয়।

নলিনীর এই আচরণ দেখে ভুবনমোহন খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। পুত্রকে সংসারে আবদ্ধ করার জন্য তিনি তাঁর বিবাহ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। যথাসময়ে নলিনীর বিয়ে হয়ে যায়। কন্যা হালিশহরের বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের মেয়ে সুধাংশুবালা। নলিনীর বয়স তখন ১৭ এবং সুধাংশুবারা ১২।

বিয়ের কিছুদিন পর নলিনীকান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করবেন। তাই পিতার অনুমতি নিয়ে তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। এখানে কিছুদিন পড়ার পর তিনি ঢাকার সার্ভে স্কুলে ভর্তি হন। কারণ, এখান থেকে পাশ করলে সহজেই চাকরি পাওয়া যায়। এখান থেকে পাশ করার পর তিনি স্বগ্রামে ফিরে যান এবং কুতবপুর স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। এর কিছুদিন পর ওভারসিয়ারের চাকরি নিয়ে দিনাজপুর সরকারি অফিসে যোগদান করেন। কিন্তু এ-চাকরিতে মিথ্যাচার করতে হয় বলে তিনি চাকরি পরিবর্তন করেন। এরপর আরেক দফা চাকরি পরিবর্তন করে তিনি কলকাতার জনৈক জমিদারের এস্টেটে চাকরি নেন। সেই উপলক্ষে তিনি তখন কলকাতায় ছিলেন। স্বামী সুধাংশুবালা তখন অন্তঃসত্ত্বা। তাই তাঁকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেখানে তাঁর একটি কন্যাসন্তান জন্মে। কয়েকদিন পর কন্যাসন্তানটি মারা যায়। স্বামীও বেশ কিছুদিন রোগভোগের পর মারা যান। এতে নলিনী খুব আঘাত পান। সংসারের প্রতি তাঁর মন উঠে যায়। তিনি চাকরিও ছেড়ে দেন। প্রায়শই তিনি স্বামী সুধাংশুবারা ছায়ামূর্তি দেখতে পান। তিনি এর রহস্য জানতে চান। পরলোক সম্পর্কে চর্চা শুরু করেন। এমনি সময় একদিন কলকাতায় পূর্ণানন্দ পরমহংসের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। পূর্ণানন্দ বলেন, স্বামী মাত্রই আদ্যাশক্তি মহামায়ার অংশ। তাঁকে পেতে হলে সাধনা করতে হবে।

এরপর নলিনী যান বীরভূমের মহাতীর্থ তারাপীঠে। সেখানে ছিলেন মহাসাধক বামাক্ষেপা। তিনি তাঁকে তারামন্ত্রে দীক্ষা দেন। আর বলেন তারামায়ের সাধনা করতে। নলিনী একমনে সাধনা করতে লাগলেন। অবশেষে মা স্বামীরূপে দেখা দিলেন। কিন্তু নলিনী তাঁকে ধরতে গেলেই তিনি মিলিয়ে যান। একথা তিনি বামাক্ষেপাকে খুলে বললেন। বললেন, ‘এ দেবী কে? আমিই- বা কে?’ বামা বললেন, ‘এ-তত্ত্ব জানতে হলে তাকে জ্ঞানসাধনা করতে হবে। জ্ঞানীগুরুর সন্ধান করতে হবে।’

বামাফেপার কথামতো নলিনী জ্ঞানীগুরুর সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। ঘুরতে ঘুরতে পুষ্করতীরে এসে জ্ঞানীগুরুর সন্ধান পান। তিনি হলেন সচ্চিদানন্দ পরমহংস। তাঁর আশ্রমে থেকে নলিনী বেদ-বেদান্ত, দর্শনশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন। গুরু তাঁকে বৈদিক সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষা দেন। তখন তাঁর নতুন নাম হয় ‘স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী’। এরপর তিনি ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থান ঘুরে বেড়ান, যেমন— কাশী, কামাখ্যা, হিমালয়, কোকিলামুখ ইত্যাদি। এসব জায়গায় তিনি যোগসাধনা করেন।

এরপর জনহিতার্থে ঠাকুর নিগমানন্দ সদুর্ধ্ব প্রচার শুরু করেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে তিনি মঠ বা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে ব্রহ্মচর্য সাধনার ব্যবস্থা করেন। কারণ তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, প্রথম জীবনে ব্রহ্মচর্য পালন না করলে পরবর্তী জীবন সুন্দরভাবে গড়ে উঠতে পারবে না। পাশাপাশি তিনি আদর্শ গৃহস্থ জীবনগঠনের ওপরও জোর দেন। এ ছাড়া ঠাকুর কৃষিকর্ম, গো-সেবা, অনাথ আশ্রম, ঋষি বিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেও জনসেবার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

ঠাকুর তাঁর আদর্শ প্রচারের জন্য ‘আর্য্য-দর্পণ’ নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে গেছেন, যা এখনও নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এটি সনাতন ধর্মের মুখপত্র হিসেবে পরিচিত। এ ছাড়া ঠাকুর ‘যোগীগুরু’, ‘জ্ঞানীগুরু’, ‘তান্ত্রিক গুরু’, ‘শ্রেমিকগুরু’, ‘ব্রহ্মচর্য সাধন’, ‘বেদান্তবিবেক’, ‘তত্ত্বমালা’ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনার মাধ্যমেও তাঁর আদর্শ প্রচার করে গেছেন।

ঠাকুর নিগমানন্দের দর্শন ছিল—‘শঙ্করের মত ও গৌরাজ্ঞের পথ’, অর্থাৎ সেবা ও ভক্তির পথে অবৈত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা। এই আদর্শ প্রচারে বাংলার চারদিকে চারটি সারস্বত আশ্রম সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে সদুর্ধ্ব প্রচারের জন্য সহস্রাধিক সারস্বত সঙ্ঘ আছে।

তত্ত্ব, জ্ঞান, যোগ ও শ্রেম— এই চতুঃসাধনে সিদ্ধ মহাসাধক ঠাকুর নিগমানন্দ ১৩৪২ সালের (১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দ) ১৩ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার অপরাহ্ন ১-১৫ মিনিটে ইহলোক ত্যাগ করেন।

ঠাকুরের কয়েকটি বাণী

১। আদর্শ গার্হস্থ্য জীবন প্রতিষ্ঠাই আমার উদ্দেশ্য। প্রাচীন ঋষিগণ প্রবর্তিত পথে চলে তোমরা আদর্শ গৃহস্থ হও। শুধু সন্ন্যাসী হয়ে বনে গেলেই ভগবান লাভ হয় না। গৃহ থেকে আদর্শ গৃহী হয়ে ধর্মসাধনা করলেও ভগবান লাভ হয়।

২। আত্মজ্ঞান কিংবা নারায়ণজ্ঞানে যথাসাধ্য জীবসেবা করো। পরের উপকার করতে কুণ্ঠিত হয়ো না। এই প্রত্যক্ষ ধর্ম ত্যাগ করলে আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ হয় না। জীবসেবাই কলির একমাত্র ধর্ম।

৩। নর-ই সাক্ষাৎ নারায়ণ। সুতরাং নরের সেবা ব্যতীত নারায়ণের কৃপা হয় না। তাই গার্হস্থ্য ধর্মের এত মাহাত্ম্য। আপন প্রাণকে বিশুপ্রাণের সঙ্গে মেলাতে হবে। স্বামী-পুত্র দ্বারা প্রথম প্রাণে যে-বীজ উগ্ধ হয়, পরে বিশ্বের কীট-পতঙ্গে সমপ্রাণতা আসে। তখন ভগবান যেচে দয়া করে থাকেন। নতুবা মুখের প্রার্থনায় তাঁর সিংহাসন টলে না।

৪। কেবল কতগুলো কর্মানুষ্ঠানে জীবনে পূর্ণতা লাভ হয়না। ভগবানে আত্মনির্ভর করতে অভ্যাস কর। কীট থেকে ব্রহ্ম পর্যন্ত একই ভগবানের বিকাশ জেনে সর্বভূতের হিতসাধনে জীবন উৎসর্গ কর। মানবজীবন ধন্য হবে। পবিত্র আনন্দের অধিকারী হবে।

ঠাকুর নিগমানন্দের জীবনী থেকে আমরা এই নীতিশিক্ষা পাই যে, মিথ্যা অহংকার কারো পক্ষেই ভালো নয়। জাতিভেদ সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে ভালোবাসতে হবে। আধ্যাত্মিক উন্নতির পাশাপাশি মানুষের বাস্তব জীবনেরও উন্নয়ন প্রয়োজন। আদর্শ গৃহী হয়েও ভগবানকে লাভ করা যায়। নারায়ণজ্ঞানে মানুষকে সেবা করতে হবে। জীবসেবাই কলির একমাত্র ধর্ম। সকল জীবের মধ্যেই ঈশ্বর আছেন। সকল জীবের সেবা করা মানেই ঈশ্বরেরও সেবা করা। তাই সর্বজীবের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে। ঠাকুর নিগমানন্দের এই শিক্ষা আমরা সব সময় মনে রাখব এবং আমাদের জীবনে পালন করার চেষ্টা করব।

দলীয় কাজ : ঠাকুর নিগমানন্দের জনহিতকর কাজের একটি তালিকা তৈরি কর।

নতুন শব্দ : কামাখ্যা, সারস্বত, আকীট।

পাঠ ১২, ১৩ ও ১৪ : ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

পাবনায় পদ্মার তীরবর্তী একটি গ্রাম হিমাইতপুর। সেই গ্রামে ১২৯৫ সালের ৩০ ভাদ্র (১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর) অনুকূলচন্দ্রের জন্ম। পিতা শিবচন্দ্র চক্রবর্তী এবং মাতা মনোমোহিনী দেবী।

হিমাইতপুরেই অনুকূলচন্দ্রের শৈশব, বাল্য ও কৈশোর অতিক্রান্ত হয়। হিমাইতপুর পাঠশালায় তিনি লেখাপড়া শুরু করেন। সেখানকার পাঠ শেষ হলে তিনি পাবনা ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন। এখানে নবম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ে তিনি



পশ্চিমবঙ্গের নৈহাটি উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এ-বিদ্যালয় থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য মনোনীত হন। কিন্তু একজন সহপাঠী পরীক্ষার ফিসের টাকা যোগাড় করতে পরেননি শুনে তাঁকে তিনি নিজের টাকা দিয়ে দেন। ফলে ঐবার তাঁর পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। পরেরবার তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন। এরপর মায়ের ইচ্ছায় তিনি কলকাতার ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। তখন তাঁদের সংসারে আর্থিক অনটন চলছিল। তাই অনেক কষ্ট করে তিনি পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। একদিন প্রতিবেশী এক ভক্তার হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ওষুধসহ তাঁকে একটি বাস্ক দেন। তা দিয়ে তিনি কুলি-মজুরদের সেবা শুরু করেন। সেবার আনন্দের মধ্য দিয়ে যা আয় হতো তাতেই তাঁর দিন চলে যেত।

অনুকূলচন্দ্র ডাক্তার হয়ে নিজ গ্রামে ফিরে আসেন। সেখানে তিনি চিকিৎসাকর্ম শুরু করেন। এতে তাঁর অভূতপূর্ব সাফল্য আসে। কিন্তু তিনি উপলব্ধি করলেন, মানুষের দুঃখের স্থায়ী সমাধান করতে হলে কেবল শারীরিক চিকিৎসা নয়, মানসিক ও আত্মিক চিকিৎসাও দরকার। কারণ শরীরের সঙ্গে মন ও আত্মার নিবিড় যোগ রয়েছে। তাই তিনি মানসিক ও আত্মিক চিকিৎসাও শুরু করলেন।

অনুকূলচন্দ্র ছিলেন সমাজের অসহায়, অবহেলিতদের বন্ধু। তাদের নিয়ে তিনি কীর্তন দল গঠন করেন। কীর্তনের মধ্য দিয়ে তিনি তাদের মানসিক শান্তির বিধান করেন। অনেক শিক্ষিত তরুণও এগিয়ে আসেন। তাঁর এই কীর্তন এক সময় একটি আন্দোলনে পরিণত হয়। সবাই তাঁকে তখন ডাক্তার না বলে বলত 'ঠাকুর'। সেই থেকে তিনি 'ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র' নামে পরিচিত হন। তাঁর খ্যাতি ক্রমশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

মানুষ যাতে সৎ পথে থাকে, সৎ চিন্তা করে সেজন্য ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র হিমাইতপুরে প্রতিষ্ঠা করেন সৎসঙ্ঘ আশ্রম। এর মাধ্যমে তিনি তাঁর অনুসারীদের আত্মিক উন্নতির জন্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সহায়তা করতেন। দলে দলে লোক তাঁকে গুরু মেনে এই সঙ্ঘে যোগ দিতে লাগল। তিনি এই সঙ্ঘের মাধ্যমে ধর্মের সঙ্গে কর্মের সংযোগ ঘটান। শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, সুবিবাহ— এই চারটি ছিল আশ্রমের মূল ভিত্তি। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস— সনাতন আর্থ জীবনের এই চারটি স্তরে জীবনযাপনে তিনি সকলকে অভ্যস্ত করে তোলেন। অনুকূলচন্দ্র লোকহিতার্থে প্রাচীন ঋষিদের আদর্শে তপোবন বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ, পাবলিশিং হাউজ, ছাপাখানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে অধ্যাত্মিক জীবনের পাশাপাশি মানুষ জাগতিক জীবনেও উপকৃত হয়। মহাত্মা গান্ধী সৎসঙ্ঘের এই কর্মকাণ্ড দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং এর প্রশংসা করেন।

১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে অনুকূলচন্দ্র বিহারের দেওঘরে যান এবং সেখানে সৎসঙ্ঘের আদর্শে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। পরের বছর ভারত ভাগ হলে তিনি আর ফিরে আসেননি। ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি ৮১ বছর বয়সে তিনি দেওঘরেই দেহ ত্যাগ করেন।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শিষ্যসম্প্রদায় এবং সৎসঙ্ঘের কর্মকাণ্ড উভয় বাংলার নানা অঞ্চলে আজও সক্রিয়। ঢাকা ও চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এর আশ্রম ও কার্যালয় আছে। এর মাধ্যমে জনগণকে সেবা দেওয়া হয়।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র তাঁর আদর্শ ও চিন্তা-ভাবনা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ৪৬ খানা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সে-সবের মধ্যে পুণ্যপুঁথি, অনুশ্রুতি, চলার সাথী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শিক্ষা ছিল : মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। যে যে-সম্প্রদায়েরই হোক না কেন, মনে রাখতে হবে ঈশ্বর এক, ধর্মও এক। সংসারে থাকবে, মন রাখবে ভগবানে। শুধু লেখাপড়া করলেই বড় হওয়া যায় না, আচার-ব্যবহারও জানতে হয়। ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের এই শিক্ষা আমরা সব সময় স্মরণে রাখব এবং মেনে চলব।

একক কাজ : ব্যক্তি ও সমাজজীবনে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শিক্ষার প্রভাব সম্পর্কে লেখ।

নতুন শব্দ : আত্মিক চিকিৎসা, লোক হিতার্থ, পুণ্যপুঁথি, অনুশ্রুতি।

পাঠ ১৫ ও ১৬ : মা আনন্দময়ী

মা আনন্দময়ীর জন্ম ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ এপ্রিল। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার খেওড়া গ্রামে। পিতা বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য, মা মোক্ষদা সুন্দরী। বিপিনবিহারীর পৈতৃক নিবাস ছিল বিদ্যাকুট। আনন্দময়ীর আসল নাম নির্মালা সুন্দরী। গ্রামের পাঠশালায় নির্মালার পড়াশোনা শুরু হয় কিন্তু পড়াশোনা বেশিদূর এগোয়নি। ছোটবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে দিব্যভাবের প্রকাশ ঘটে। হরিনাম কীর্তন হলে তিনি আকুল হয়ে শুনতেন।



বাংলা ১৩১৫ সালের (১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দ) ২৫ মাঘ নির্মালার বিয়ে হয়। তখন তাঁর বয়স তেরো শেষ হয়ে চৌদ্দ বছরে পড়েছে। স্বামী রমণীমোহন চক্রবর্তী। বাড়ি বিক্রমপুরের আটপাড়া গ্রামে। বিয়ের পর নির্মালা স্বামীর নাম দেন ভোলানাথ। ভোলানাথ বাজিতপুরে সেটেলমেন্ট বিভাগে চাকরি করেন। ১৩২৪ সালে (১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দ) নির্মালা স্বামীর কর্মস্থলে যান। তাঁর মধ্যে ক্রমশই দিব্যভাব প্রকটিত হতে থাকে। কোথাও কৃষ্ণনাম শুনলে কৃষ্ণপ্রেমে তিনি আকুল হয়ে যান। একবার ভূদেবচন্দ্র বসুর বাড়িতে কীর্তন হচ্ছে :

হরিহরয়ে নমঃ কৃষ্ণাদবায় নমঃ।

বাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ ॥

নির্মালা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কীর্তন শুনতে শুনতে এক সময় তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। তখন তাঁর দেহ থেকে দিব্য আলো প্রকাশিত হচ্ছিল। সবাই ভয় পেয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি আবার সুস্থ হয়ে উঠলেন। এভাবে নির্মালার মধ্যে মহাভাবের শুরু। সাধারণ মানুষের অজ্ঞাতে তাঁর শরীরে চলতে লাগল সাধন-ভজনের নানারকম লীলা। দিব্য জ্যোতির আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর সমস্ত শরীর।

১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে ভোলানাথ চলে আসেন ঢাকার শাহবাগে। তখনকার নবাবের বাগানের তত্ত্বাবধায়কের কাজ নিয়ে। সঙ্গে নির্মালাও আসেন। এই শাহবাগে মা কালীর মন্দিরে নির্মালার মধ্যে মাতৃমূর্তি প্রকটিত হয়। তখন থেকেই তিনি ‘মা আনন্দময়ী’ নামে খ্যাত হন। এখানেই তাঁর সাধন-ভজন চলতে থাকে। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধেশ্বরীতে তাঁর আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। এটিই তাঁর আদি আশ্রম।

১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে মা আনন্দময়ী স্বামীসহ চলে যান দেৱাদুনে। ফলে তাঁর লীলাক্ষেত্র ঢাকা থেকে স্থানান্তরিত হয় উত্তর

ভারতে। সেখানে তাঁর দিব্যতাবের পরিচয় জানাজানি হলে অনেকে তাঁর ভক্ত হয়ে যান। ভারতের অনেক জ্ঞানী-গুণী তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। তাঁদের সঙ্গে মায়ের সাক্ষাৎ হয়েছে। এমনকি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, মিসেস ইন্দিরা গান্ধী প্রমুখ ব্যক্তির সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে।

মা আনন্দময়ী নিজে ভগবৎপ্রেমী ছিলেন। তাই ভারতের জনগণকেও ভগবৎমুখী করার কাজে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তিনি উপমহাদেশের পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ সর্বত্র পরিভ্রমণ করেছেন। প্রাচীন ভারতের অনেক লুপ্ত তপোবন ও তীর্থস্থান তিনি পুনরুজ্জীবিত করেছেন। ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মস্থল, সহস্র ঋষির তপোভূমি নৈমিষারণ্যকে তিনি জাগিয়ে তোলেন। এখন সেখানে কীর্তন, নাচ, গান, ধর্মগ্রন্থপাঠ, সংসজ্ঞ ইত্যাদি কর্মকাণ্ড চলছে। এভাবে তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানের সুপ্ত, লুপ্ত ধর্মস্থানকে জাগ্রত করেছেন। সেখানে যাগ-যজ্ঞ, মন্দির, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে সনাতন ধর্মের ভাবধারায় উজ্জীবিত করে তুলেছেন। মানুষের মনকে ভগবৎমুখী করার জন্য অশেষ প্রেরণা দিয়ে গেছেন। বাংলাদেশের রমনা ও খেওড়ার দুটি আশ্রমসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে তিনি ২৫টি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন। হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে এটি মায়ের সবিশেষ উল্লেখযোগ্য অবদান। মা আনন্দময়ী বলতেন, 'যে যে অবস্থায় আছ, সেই অবস্থায় থেকেই কর্ম করে যাও। নাম কর, শুধু নাম। নামেই সব হয়।'

১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ আগস্ট মা আনন্দময়ী পরলোক গমন করেন। হরিদ্বারে কণখল আশ্রমে গঙ্গার তীরে তাঁর মরদেহ সমাধিস্থ করা হয়।

মা আনন্দময়ীর জীবনী থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, সর্বদা ভগবানের নাম নিতে হবে। তাঁর নামে সব কিছু করতে হবে। কর্তব্যকর্মে অবহেলা করা চলবে না। আমাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। মায়ের এই শিক্ষা আমরা মেনে চলব।

একক কাজ : ধর্ম ও সংস্কৃতিচর্চায় ক্ষেত্রে মা আনন্দময়ীর অবদান সম্পর্কে লেখ।

নতুন শব্দ : দিব্যতাব, পুনরুজ্জীবিত, সমাধিস্থ।

পাঠ ১৭ ও ১৮ : শ্রীল ভক্তিবেদান্তস্বামী প্রভুপাদ



শ্রীল ভক্তিবেদান্তস্বামী প্রভুপাদ ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর উত্তর কলকাতার ১৫১ নং হ্যারিসন রোডের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম গৌরমোহন দে এবং মায়ের নাম রজনী। প্রভুপাদের প্রকৃত নাম অভয়চরণ দে।

গৌরমোহন এক জ্যোতিষীকে দিয়ে পুত্রের কোষ্ঠী তৈরি করিয়েছিলেন। তিনি একটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এই শিশু ৭০ বছর বয়সে সমুদ্র পাড়ি দেবে। বিদেশে যাবে। একজন ধর্মপ্রচারক হিসেবে খ্যাতি লাভ করবে এবং ১০৮টি মন্দির প্রতিষ্ঠা করবে। তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রায়

সবটাই সত্যে পরিণত হয়েছে। অভয়চরণ ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ৬৯ বছর বয়সে আমেরিকা যান। সেখানে হিন্দুধর্ম প্রচার করেন। ক্রমশ তাঁর খ্যাতি পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। কৃষ্ণনাম প্রচারের জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ‘আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ’, সংক্ষেপে যা ‘ইসকন’ নামে পরিচিত। আর তিনি পরিচিত হন ‘শ্রীল ভক্তিবেদান্তস্বামী প্রভুপাদ’ নামে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তিনি শতাধিক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

গৌরমোহন দে ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত বঙ্ক -ব্যবসায়ী। কিন্তু ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন একজন বিশুদ্ধ বৈষ্ণব। নিয়মিত কৃষ্ণনাম জপ করতেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ছিলেন তাঁর আদর্শ। চৈতন্য প্রবর্তিত ‘হরে কৃষ্ণ হরে রাম’ ছিল তাঁর সাধনার মূলমন্ত্র। তিনি নিয়মিত শ্রীমদভাগবদ্গীতা ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করতেন। তিনি চাইতেন ছেলে অভয়চরণও তাঁর মতো বৈষ্ণব হোক। এজন্য তিনি তাঁকে নিয়মিত রাধা-কৃষ্ণ মন্দিরে নিয়ে যেতেন। বালক বয়সেই তাঁকে মৃদঙ্গ বাজানো সেখান। ভজন, কীর্তন ইত্যাদি শেখায় উৎসাহ দেন।

অভয়চরণের মা রজনী দেবী ছিলেন বর্ষিষ্ণু গৌড়ীয় বৈষ্ণব পরিবারের কন্যা। তাই তাঁর মধ্যেও বৈষ্ণবভাবের প্রকাশ ঘটে। তিনি ছিলেন পতিব্রতা ও ধর্মপরায়ণা একজন আদর্শ স্ত্রী ও জননী। বালক অভয়চরণ দেখতেন, তাঁর মা কীরকম সরলতাসহকারে সকলের মজ্জালের জন্য প্রার্থনা করতেন। পূজা-পার্বণ অনুষ্ঠান করতেন। মায়ের এই ভক্তি, সরলতা ও কর্তব্যপরায়ণতা বালক অভয়চরণের মনে গভীর প্রভাব ফেলে।

অভয়চরণ কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজে স্নাতক শ্রেণির ছাত্র। এ-সময় তাঁর বিয়ে হয়। স্ত্রীর নাম রাধারাণি দেবী। কিন্তু রাধারাণি পিত্রালয়েই অবস্থান করছিলেন, অভয়চরণের পড়াশোনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত।

তখন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ক্রমশ তীব্রতর হচ্ছিল। অভয়চরণের ওপর তার একটা প্রভাব পড়েছিল। একই কলেজে এক ক্লাস ওপরে পড়তেন সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেওয়ার জন্য ছাত্রদের উৎসাহ দিতেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব, বক্তৃতা ও সাংগঠনিক ক্ষমতা দেখে অভয়চরণ মুগ্ধ হন। কিন্তু সরাসরি আন্দোলনে যোগ দেন না। তবে ইংরেজদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি তাঁর একটা অনীহার ভাব সৃষ্টি হয়। এর চেয়ে তিনি ভারতের নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থাকে অধিকতর মজ্জালজনক মনে করেন।

মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের প্রতিও অভয়চরণ একটা আকর্ষণ অনুভব করেন। মনোযোগ দিয়ে তিনি তাঁর বক্তৃতা-বিবৃতি শুনতেন এবং পাঠ করতেন।

১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে অভয়চরণ সাফল্যের সাথে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু এ-সময় পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে শতশত নিরস্ত্র-নিরীহ মানুষকে ইংরেজ সৈন্যরা হত্যা করে। এর প্রতিবাদে গান্ধীজি ইংরেজদের সবকিছু বর্জনের আহ্বান জানান। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে অভয়চরণ তাঁর ডিগ্রি প্রত্যাখ্যান করেন। এ-ঘটনার পর পিতার ইচ্ছায় তিনি একটি ওষুধ কোম্পানিতে চাকরি নেন এবং ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে এই কাজেই সপরিবারে এলাহাবাদ চলে যান।

এলাহাবাদে এসেই অভয়চরণের জীবনের মোড় ঘুরে যায়। এখানে তিনি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর সঙ্গে অভয়চরণের ইতঃপূর্বেও (১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে) কলকাতায় একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল। অভয়চরণ তখন স্বদেশী আন্দোলনের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন। সরস্বতী ঠাকুর তখন তাঁকে বলেছিলেন, ‘এসব আন্দোলনের চেয়ে চৈতন্য মহাপ্রভুর বৈষ্ণব আন্দোলন অনেক কার্যকর। “হরে কৃষ্ণ হরে রাম” কীর্তন অতি সহজেই সকল শ্রেণির মানুষকে কাছে টানতে পারে। সংসারের সমস্ত রকম দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়ে শান্তি দিতে পারে। কলিযুগে জীবোদ্ধারের এটাই একমাত্র পথ।’ সেই একই কথা ঠাকুর এবারও অভয়চরণকে বললেন। অভয়চরণ এবার গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে কাজ শুরু করে দিলেন।

অভ্যচরণ গুরুর উপদেশ ও নিজের আদর্শ প্রচারের জন্য Back to Godhead নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ শুরু করলেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তাঁর তিনটি প্রিয় গ্রন্থ ছিল। তিনি প্রথম দুটির ভাষ্য রচনা করেন। সবার কাছেই তা অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছে। তিনি তাঁর পত্রিকা এবং গ্রন্থ তৎকালীন ভারতের বিখ্যাত মনীষীদের কাছে পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণন, লালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রমুখ। এঁদের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎও করেছেন। এঁরা তাঁর কাজের উচ্চপ্রশংসা করেছেন।

অভ্যচরণ এক সময় কৃষ্ণনাম বা কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের জন্য চাকরি, সংসার সব ছেড়ে দেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ান। এক পর্যায়ে তিনি বৃন্দাবনে যান। সেখানে তিনি সন্যাসধর্মে দীক্ষা নেন। তখন তাঁর নাম হয় ‘অভ্যচরণারবিন্দ ভক্তিবৈদান্তস্বামী’। আরও পরে তিনি ‘শ্রীল ভক্তিবৈদান্তস্বামী প্রভুপাদ’ নামে খ্যাত হন।

১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর প্রভুপাদ শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র বৃন্দাবনে ইহলীলা সংবরণ করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বিশ্বাস করতেন, সকল জাতির মধ্যে কৃষ্ণভাবনামৃত ছড়িয়ে দিতে পারলে কোনো জাতিভেদ থাকবে না। হিংসা-বৈদ্বেষ থাকবে না। সবাই সবাইকে ভালোবাসবে। যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি ধ্বংসাত্মক কাজ থেমে যাবে। তাঁর গুরু সরস্বতী ঠাকুরও তাঁকে একথাই বলেছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন, ভারতবর্ষের বাইরেও এই কৃষ্ণভাবনামৃত ছড়িয়ে দিতে হবে। তাহলে এর মাধ্যমে বিশ্বভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠবে। এ-কারণেই শ্রীল প্রভুপাদ ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকা যান। পরের বছর ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে নিউ ইয়র্কে প্রতিষ্ঠা করেন ‘আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সঙ্ঘ’ (ইসকন)। পর্যায়ক্রমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রভুপাদ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই সংস্থাটি পরিচালনা করেন। তিনি শতাধিক মন্দির, আশ্রম, স্কুল ও কৃষ্ণকেন্দ্রের সমন্বয়ে এটিকে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইসকনের ৩৫০টিরও বেশি মন্দির রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মায়াপুরে এর প্রধান মন্দির অবস্থিত। বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা প্রভৃতি শহরেও ইসকনের মন্দির রয়েছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের হাজার হাজার মানুষ প্রভুপাদ-প্রবর্তিত এই মতাদর্শে আকৃষ্ট হয়ে কৃষ্ণনামে দীক্ষিত হচ্ছেন। এভাবে তাঁরা একটি কৃষ্ণ-পরিবার তৈরি করে চৈতন্যদেব-প্রবর্তিত বৈষ্ণবীয় জীবনাচার পালন করছেন। ইসকনের মূল উদ্দেশ্য কৃষ্ণনামের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত করা। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা-ভালোবাসা সৃষ্টি করা। মানুষ-মানুষে ভেদাভেদ দূর করা। জ্ঞানের আলো দ্বারা অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার দূর করা। বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ করা। শিশুদের মধ্যে শিক্ষাদান করা। দরিদ্রদের মধ্যে দাতব্য চিকিৎসা প্রদান করা। গীতার দর্শন ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে দূরত্ব কমিয়ে আনাও ইসকনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

নতুন শব্দ : মৃদঙ্গা, বর্ধিষ্ণু, গৌড়ীয় বৈষ্ণব, ইসকন, বৈষ্ণবীয় জীবনাচার।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থী উপরে বর্ণিত মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারীদের ছবি সংগ্রহ করবে। তাঁদের শিক্ষাসমূহ একটা কাগজে লিখে পড়ার টেবিলের সামনে টানিয়ে রাখবে, যাতে সব সময় তা চোখে পড়ে। পাঠ্য-বহির্ভূত অন্যান্য মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারীদের সম্পর্কেও জানার চেষ্টা করবে এবং তাঁদের ছবি সংগ্রহ করার চেষ্টা করবে।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. কৃষ্ণ সারাজীবনই রক্ষা করেছেন।
২. দুর্বল শরীরে হয় না।
৩. নলিনীর দাদামশাই ছিলেন।
৪. ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র শারীরিক চিকিৎসার পাশাপাশি চিকিৎসাও শুরু করেন।
৫. শাহবাগে মা কালীর মন্দিরে নির্মলার মধ্যে প্রকটিত হয়।

ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বামপাশের সাথে মিল কর :

| বাম পাশ | ডান পাশ |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| ১. জরাসন্ধ ছিলেন মগধদের রাজা এবং | দুর্যোধনের আত্মীয় |
| ২. মতুরা সম্প্রদায় হরিচাঁদ ঠাকুরকে | বিষ্ণুর অবতার হিসেবে জ্ঞান করেন |
| ৩. নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট | ভ্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা নেন |
| ৪. নলিনী জ্ঞানী গুরুর সম্ভান পান | নিজ গ্রামে ফিরে আসেন |
| ৫. অনুকূলচন্দ্র ডাক্তার হয়ে | কংসের শৃগুর পুষ্করতীরে |

নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১. পৃথিবীতে শ্রীকৃষ্ণের অবতীর্ণ হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।
২. হরিচাঁদ ঠাকুরের অনুসারীদের ‘মতুরা’ বলার কারণ ব্যাখ্যা কর।
৩. ঠাকুর নিগমানন্দের পরলোক সম্পর্কে চর্চা করার মূল কারণ ব্যাখ্যা কর।
৪. ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র মানসিক চিকিৎসা শুরু করেছিলেন কেন?
৫. স্বামী বিবেকানন্দ যুবকদেরকে শরীর গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন কেন?

নিচের প্রশ্নগুলো উত্তর দাও :

১. ‘শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কংস বধ ছিল অবশ্যম্ভাবী’ মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।
২. শিকাগোর বিশ্বধর্ম সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণের প্রভাব বর্ণনা কর।
৩. ঠাকুর নিগমানন্দের দর্শন ব্যাখ্যা কর।
৪. ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত সংস্কারের কর্মকাণ্ড বর্ণনা কর।
৫. ‘ইসকনের’ মূল উদ্দেশ্য ও সমাজে এর প্রভাব বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নির্বাচিত হয়েছিলেন কে ?

- | | |
|----------|--------------|
| ক. ভীষ্ম | খ. শ্রীকৃষ্ণ |
| গ. বলরাম | ঘ. বিদুর |

২. 'ধর্মচর্চার জন্য সংসারত্যাগের প্রয়োজন নাই'— এরূপ বক্তব্যটি—

- হরিচাঁদ ঠাকুরের
- ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের
- মা আনন্দময়ীর

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

মনমোহনবাবু জনদরদি ও ধার্মিক মানুষ কিন্তু তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত। হাটে ব্লক ধরা পড়েছে। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি টাকার সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে অপারেশনের জন্য ভর্তি হন। তিনি লক্ষ করলেন তাঁর পাশের রোগীর অবস্থা আরও খারাপ। কিন্তু টাকার অভাবে অপারেশন করতে পারছে না। তিনি তাঁর নিজের অপারেশনের টাকা পাশের রোগীকে দিয়ে দেন।

৩. মনমোহনবাবুর আচরণে কোন সাধকের আদর্শ ফুটে উঠেছে ?

- স্বামী বিবেকানন্দের
- ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের
- হরিচাঁদ ঠাকুরের
- ঠাকুর নিগমানন্দের

৪. সাধন-ভজনে উক্ত সাধকের মর্মকথা হলো—

- জীবসেবা করলে ঈশ্বরসেবা হবে
- সংসারে থেকেও ভগবানের প্রতি মন রাখতে হবে
- ভক্তির সঙ্গে হরির নাম নিলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে
- সেবা ও ভক্তির পথেই অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হবে।

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. কাননদেবী চাকুরি, সাংসারিক কাজ ও ধর্মকর্ম সুনিপুণভাবে পালনের মাধ্যমেই ঈশ্বরসেবার আনন্দ পান। ব্যক্তিজীবনে তাঁর একটি বিশেষ আকাঙ্ক্ষা ছিল বাড়িতে রাধা-গোবিন্দের মন্দির প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর ইচ্ছাটি সার্থকভাবে পূরণ করার জন্য তিনি উপার্জিত অর্থে এলাকার পুরাতন মন্দির সংস্কার ও একটি নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠা করে রাধাগোবিন্দের পূজার ব্যবস্থা করেন। তিনি এলাকার মানুষকে দেব-দেবীর পূজার মাধ্যমেই ঈশ্বরজ্ঞানে পূর্ণতা লাভ করা যায় এ-বিষয়ে সচেতন করেন।

ক. মা আনন্দময়ীর পূর্বনাম কী ?

খ. মা আনন্দময়ীর কৃষ্ণশ্রেমে আকুল হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. কাননদেবীর সংসারধর্ম পালনের সাথে মা আনন্দময়ীর কর্মময় জীবনের কী বৈসাদৃশ্য রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘এলাকার মানুষের প্রতি কাননদেবীর ঈশ্বর-আরাধনার বক্তব্য যেন মা আনন্দময়ীর বক্তব্যেরই প্রতিফলন’- তুমি কি এই বক্তব্যের সাথে একমত ? তোমার মতের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

২. বিধান ও কমল এলাকায় চিহ্নিত সজ্ঞাসী ও চাঁদাবাজ। তাদের অত্যাচারে এলাকার জনগণ অতিষ্ঠ। শ্যামল সং ও ধর্মপরায়ণ। এলাকাতে তিনি অনেককেই ধর্মপথে ফিরিয়ে এনেছেন। বিধান ও কমলকে আইনের রক্ষকগণ নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে চাইলেও শ্যামল তাতে আপত্তি জানান। তিনি বিধান ও কমলকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব নিলেন। শ্যামল বিধানকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারলেও কমলকে ফিরিয়ে আনতে পারেননি। কমল তার আগের কর্ম পরিত্যাগ করতে পারেনি। একদিন অপরাধ সংঘটনকালে সে জনগণের হাতে ধরা পড়ে এবং নিহত হয়।

ক. জরাসন্ধ কোন রাজ্যের রাজা ছিলেন ?

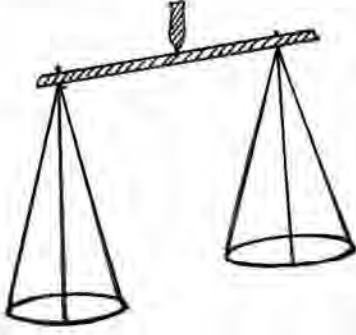
খ. দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলায় আহ্বান করেছিলেন কেন ? ব্যাখ্যা কর।

গ. কোন নৈতিক শিক্ষার আলোকে শ্যামল বিধানকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে এনেছিলেন? তোমার পঠিত ‘শ্রীকৃষ্ণের জীবনচরিত’ শিক্ষার আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ন্যায়ের পথে কমলের ফিরে না আসার কারণ তোমার পঠিত শ্রীকৃষ্ণের কংসবধের শিক্ষার আলোকে মূল্যায়ন কর।

অষ্টম অধ্যায় হিন্দুধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধ

ব্যক্তি, সমাজ বা জাতি ও বৈশ্বিক পর্যায়ে একজন ব্যক্তি বা জাতির আচরণ অন্য ব্যক্তি ও সমাজ বা জাতির প্রতি কেমন হবে, তা নির্ধারণের মাপকাঠিটাই হচ্ছে নৈতিক মূল্যবোধ। যেমন— মানবতাবোধ, সৎসাহস, ন্যায়বিচার, সৎসজ্জা, সংযম, অহিংসা প্রভৃতি।



আমার জ্ঞান, নৈতিক মূল্যবোধের মাপকাঠিতে বিচার করা যায়, কে বা কোন জাতি কতটা সত্য? ব্যক্তি ও সামাজিক ক্ষেত্রে ধর্ম নৈতিক মূল্যবোধ গঠনে সহায়তা করে। আবার নৈতিক মূল্যবোধ থেকে বোঝা যায়, কে কতটুকু ধর্মীয় মহৎ আদর্শ পালন করে। সুতরাং ধর্মের সঙ্গে নৈতিক মূল্যবোধের একটা সম্পর্ক রয়েছে। হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য।

আমরা এ-অধ্যায়ে নৈতিক মূল্যবোধের ধারণা এবং ন্যায়বিচার, সৎসজ্জা, সংযম ও অহিংসা— এ-মূল্যবোধগুলো হিন্দুধর্মের আলোকে ব্যাখ্যা করব। ব্যাখ্যা করব পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এসকল মূল্যবোধ গঠনের উপায়।

অহিংসা এবং সহিংসতা সম্পর্কে আলোচনা করব এবং এইডস রোগের কারণ, এর প্রভাব ও এর প্রতিরোধের উপায় ব্যাখ্যা করব।

এ-অধ্যায় থেকে আমরা—

- □ নৈতিক মূল্যবোধের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- □ হিন্দুধর্মের আলোকে ন্যায়বিচার, সৎসজ্জা, সংযম ও অহিংসা— এ-নৈতিক মূল্যবোধগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব
- □ পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ন্যায়বিচার, সৎসজ্জা, সংযম ও অহিংসা— এ-নৈতিক মূল্যবোধগুলো গঠনের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব
- □ এইচআইভি/এইডসের কারণ, প্রভাব ও এর প্রতিরোধে করণীয় এবং এইডস রোগে আক্রান্ত রোগীর সাথে কীরূপ আচরণ করা উচিত, তা হিন্দুধর্মের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারব
- □ ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে আলোচিত নৈতিক মূল্যবোধগুলোর প্রতিফলন ঘটাতে উদ্বুদ্ধ হব।

পাঠ ১ : নৈতিক মূল্যবোধের ধারণা

আমরা জানি, ‘নীতি’ কথাটির অর্থ হচ্ছে কোনটা ভালো কাজ আর কোনটা মন্দ কাজ তা উপলব্ধি করে ভালো কাজ করায় উদ্বুদ্ধ হওয়া এবং ভালো কাজে আত্মনিয়োগ করার প্রবণতা।

নীতির সঙ্গে জড়িত যে-বিষয়, তাকে বলা হয় ‘নৈতিকতা’। যেমন, নৈতিক শিক্ষার অর্থ নীতি-সম্পর্কিত শিক্ষা।

সত্য কথা বলা উচিত। তাই আমরা সবাই সর্বদা সত্য কথা বলব। গুরুজনদের ভক্তি করা কর্তব্য। তাই সবাই গুরুজনদের ভক্তি করব, তাঁদের সেবা করব। ঈশ্বরজ্ঞানে জীবের সেবা করব। কারণ জীবের মধ্যে আত্মারূপে ঈশ্বর বিরাজ করেন। এভাবে নৈতিক শিক্ষা থেকে জীবনযাপনের ক্ষেত্রে আমাদের যে-নৈতিকতাবোধ জাগ্রত হয়, তার নাম মূল্যবোধ।

সকল মানুষেরই এ-মূল্যবোধ থাকা প্রয়োজন। যদি কোনো ব্যক্তির মধ্যে বা সমাজে এর ঘাটতি দেখা দেয়, তাহলে আমরা বলি, মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটেছে। এ-মূল্যবোধের প্রকাশ নানাভাবে ঘটতে পারে। যেমন— রুচি বা সৌন্দর্য সম্পর্কে মূল্যবোধ, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে মূল্যবোধ ইত্যাদি। ব্যক্তি, সমাজ বা জাতি এবং আন্তর্জাতিক— এ-তিন পর্যায়েই নির্দিষ্ট মূল্যবোধ দ্বারা আমরা পরিচালিত হই।

মূল্যবোধকে যখন নীতির সঙ্গে সম্পর্কিত করে দেখা হয়, তখন তাকে বলা হয় নৈতিক মূল্যবোধ।

‘মূল্য’ কথাটা দ্বারা মান বা পরিমাণ বোঝায়। মূল্যবোধ হচ্ছে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার বোধের একটা অংশ মাত্র। সুতরাং এদিক থেকে ‘নৈতিক মূল্যবোধ’ মূল্যবোধের একটা মানকে নির্দেশ করে। যেমন— কোনো মানুষকে আমরা কেমন দৃষ্টিতে দেখব? নৈতিক মূল্যবোধ বলে : নিজের সমান জ্ঞান করতে হবে। কিন্তু আমরা অনেক সময় পেশা বিত্ত পদমর্যাদা প্রভৃতি বিবেচনা করে ব্যবহারের মান নির্ধারণ করি। এতে নৈতিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটে না। যখন মানুষকে প্রকৃত মর্যাদা ও সম্মান দিতে বিত্ত, পেশা, পদমর্যাদা, ধর্মমত বিবেচনায় না নিয়ে, সাম্যের দৃষ্টিতে দেখি, তখন তার মধ্যে ঘটবে নৈতিক মূল্যবোধের প্রকৃত প্রকাশ।

ধর্মের সঙ্গে নৈতিক মূল্যবোধের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ধর্মসম্মত জীবনযাপনের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটে। আবার নৈতিক মূল্যবোধগুলো ধর্মের অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়।

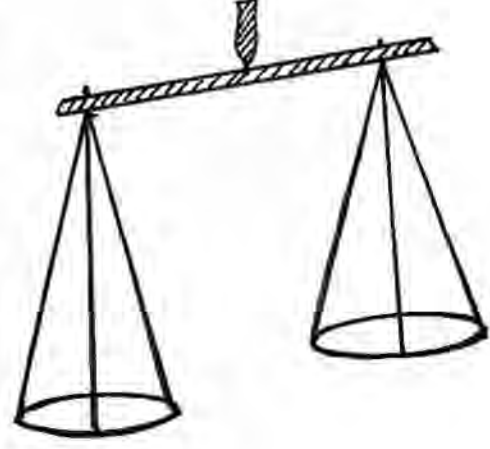
হিন্দুধর্ম নৈতিক মূল্যবোধের একটি উচ্চমান প্রত্যাশা করে। যিনি ধার্মিক, তাঁর আচরণের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটতেই হবে। কারণ নৈতিক মূল্যবোধগুলো ধর্মের অঙ্গ।

এখানে আমরা হিন্দুধর্মের আলোকে ন্যায়বিচার, সংসজ্ঞা, সংযম, অহিংসা— এ-মূল্যবোধগুলো সম্পর্কে জানব।

নতুন শব্দ : উদ্বুদ্ধ, বিত্ত, প্রতিপালন।

পাঠ ২ : ন্যায়বিচার

একসঙ্গে বসবাস করতে গিয়ে মানুষ যে-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে, তার নাম সমাজ। সমাজে সকলকে মিলেমিশে থাকতে হয়। কিন্তু নানা কারণে সমাজের সদস্যদের মধ্যে মতের অমিল দেখা দেয়। মতের অমিল মনের অমিলে পরিণত হয়ে রাগড়া পর্যন্ত গড়ায়। তখন দুপক্ষের মধ্যে কে সঠিক এবং কে সঠিক নয়, তা নির্ণয় করতে হয়। আবার দুপক্ষের জন্য কাউকে অভিযুক্ত করলেই তাকে দণ্ড দেওয়া যায় না। আসলেই সে অপরাধী কি না তা নির্ধারণ করতে হয়। কোনো বিষয়ে কে সঠিক এবং কে ভ্রান্ত, অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী না নিরপরাধি এ-বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের যে পদ্ধতি, তার নামবিচার।



বিচারককে থাকতে হয় নিরপেক্ষ। তাঁকে নির্ভুলভাবে বিচার করতে হয় কে সঠিক আর কে সঠিক নয় কিংবা অভিযুক্ত অপরাধী না নিরপরাধ। কোনো পক্ষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব না দেখিয়ে নীতি এবং ধর্ম বা আইনের আলোকে বিচার করার নাম ন্যায়বিচার।

ন্যায়বিচার সমাজকে সুপথে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। বিচারক যখন বিচার করেন, তখন কে পুত্র, কে বন্ধু, কে আত্মীয়, তা দেখেন না। তাঁকে ন্যায়-নীতি, ধর্ম বা আইন এবং যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হতে হয়। সেখানে শ্রদ্ধা, স্নেহ, ভালোবাসা প্রভৃতি আবেগের কোনো স্থান নেই। অভিযুক্ত ব্যক্তির জন্য কষ্ট পেলেও বিচারককে ন্যায়বিচার করতে হয়।

এ-বিষয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন—

দণ্ডিতের সাথে দণ্ডদাতা কাঁদে যবে

সর্বশেষে সে বিচার।

আমরা বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদের কথা জানি। তিনি দৈত্যকূলে জন্ম নিয়েও বিষ্ণুভক্ত হয়েছেন। ন্যায়বিচারের জন্যও তিনি প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। এখন মহাভারত থেকে তাঁর ন্যায়বিচারের একটি উপাখ্যান জানব।

পাঠ ৩ : প্রহ্লাদের ন্যায়বিচার

বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদ রাজত্ব করছেন। তাঁর সুশাসনে প্রজারা সুখেই আছে। তাঁর ছেলে বিরোচন। বিরোচন রাজপুত্র বলেই হোক, আর নিজের চরিত্রের জন্যই হোক, কিছুটা উদ্ভ্রান্ত আর অহংকারী। তখন রাজধানীতে সুধন্বা নামে এক তরুণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই সুধন্বার সঙ্গে রাজপুত্র বিরোচনের সম্পর্ক ভালো ছিলো না। একবার দুজনের মধ্যে কে জ্ঞানে ও গুণে অগ্রগণ্য তা নিয়ে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। তখন বিরোচন বলেন, “চলো, আমরা বিদ্বান ব্যক্তিদের কাছে এ-বিষয়ে বিচারের ভার অর্পণ করি।”



তখন সুধম্মা বললেন, ‘রাজা হলেন শাসক। সুতরাং রাজার কাছেই বিচার প্রার্থনা করা উচিত। চলো, আমরা তোমার পিতা মহারাজ প্রহ্লাদের কাছে যাই। আশা করি তিনি ন্যায়বিচার করবেন।’

দুজনে মহারাজ প্রহ্লাদের কাছে গিয়ে বিচার প্রার্থনা করলেন। মহারাজ প্রহ্লাদ সব শুনে বললেন, ‘রাজপুত্র বিরোচন শক্তিমান ও বুদ্ধিমান; কিন্তু তার ঔন্মত্য ও অহংকার তার চরিত্রকে কিছুটা মলিন করেছে— যেমন চাঁদের রয়েছে কলঙ্ক।’

বিরোচন : পিতা—

প্রহ্লাদ : হ্যাঁ পুত্র। বাধা দিও না, আমাকে বলতে দাও।

প্রহ্লাদ বলতে লাগলেন, ‘ব্রাহ্মণকুমার সুধম্মা ধর্মপারায়ণ, সত্যবাদী এবং ধৈর্য ও সংযমের বলে বলীয়ান। অহিংসা তার চরিত্রকে আরও উজ্জ্বল করেছে। সুতরাং বিরোচন ও সুধম্মার মধ্যে সুধম্মাই জ্ঞানে ও গুণে অগ্রগণ্য।’

পুত্রের প্রতি পক্ষপাতিত্ব না দেখিয়ে নিরপেক্ষভাবে প্রহ্লাদের এ-বিচার ন্যায়বিচারের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে।

একক কাজ : প্রহ্লাদের ন্যায়বিচারের শিক্ষা তুমি কীভাবে জীবনাচরণে প্রয়োগ করবে।

পাঠ ৪ ও ৫ : সৎসজ্জা

সৎসজ্জা হচ্ছে সৎলোকের সান্নিধ্য। সৎ লোকের সজ্জে চলা-ফেরা, ওঠা-বসা কিংবা জীবনযাপন। সৎসজ্জা অত্যন্ত মধুর। সৎলোকের সজ্জে থাকলে নিশ্চিত থাকা যায়। কারণ সৎলোক কারো ক্ষতি তো করেনই না, বরং পারলে উপকার করেন। তাই তো প্রবচন রয়েছে, ‘সৎসজ্জে স্বর্গবাস, অসৎসজ্জে সর্বনাশ’।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদের বহুবার সৎসজ্জার কথা ভক্তদের বলেছেন। তিনি বলেছেন যে সৎসজ্জা মনকে পবিত্র করে, চরিত্রকে উন্নত করে এবং ভক্তিতাব জাগ্রত করে।

আমরা শুনছি পরশপাথর লোহাকে স্বর্ণে পরিণত করে। তেমনি সৎসজ্ঞা দুর্বৃত্তকেও সৎ ও মহৎ করে তোলে।

এ-সম্পর্কে একটি কাহিনী বলছি।

সাধু ও শ্রীধর

ছায়া সুনিবিড় সুন্দর একটি গ্রাম। সেখানে বাস করত একটি কিশোর। নাম তার শ্রীধর। ভীষণ দুষ্ক ছিল সে, অল্পতেই রেগে যেত। বাগড়া লাগিয়ে মারামারি করত। এমনকি চুরি করতেও তার কোনো কুষ্ঠা ছিল না।

শ্রীধর একদিন ঘুরতে ঘুরতে এল বদরিকা আশ্রমে। বিখ্যাত আশ্রম। কত মন্দির, কত ধর্মশালা, কত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

সেখানকার এক মন্দিরে গেল সে। দেখল, মন্দিরের বিগ্রহের গলায় বুলছে মুক্তার মালা। রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে। তারপর গভীর রাতে সুকৌশলে চুরি করল দেববিগ্রহের গলার সেই মুক্তার মালা। চুরি করে সেখান থেকে পালাল সে।

সুন্দর মালাটি গলায় পরে সে পথে চলতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে সে এল এক সাধুর আশ্রমে।

সাধু তাঁর সাধনার পাশাপাশি সেবা-শুশ্রূষা করেন। বলেন, জীবকে সেবা করলে ঈশ্বরকে সেবা করা হয়।



সাধু শ্রীধরকে বললেন, 'আমার একটা উপকার করতে পারবে, বাবা?'

শ্রীধর, 'কী করতে হবে বলুন।'

সন্ন্যাসী তখন তাঁর বোলা থেকে একটি মুক্তা বের করে বললেন, 'এ মুক্তাটি একজনের মালা থেকে খসে পড়েছে। মালার মালিক বদরিকা আশ্রম থেকে এসেছেন। তিনি চলছেন তাঁর দেশে। মুক্তাটি আমি তোমায় দিচ্ছি। পথ চলতে যদি দেখা হয়, তাহলে ওটা তাঁকে দিয়ে দিও।' শ্রীধর মুক্তাটি হাতে নিল তারপর নিজের মালায় হাত দিয়ে দেখল, মুক্তাটি তার গলার মালা থেকেই খসে পড়েছে। কখন কীভাবে পড়েছে, তা সে নিজেই জানে না।

সাধুকে প্রশ্ন করল শ্রীধর, 'আপনি কেমন করে জানলেন যে আমার গলার মালা থেকেই মুক্তা খসে পড়েছে? কিন্তু মালাটি আমার নয়, আমি এটা বদরিকা আশ্রমের এক দেববিগ্রহের গলা থেকে চুরি করেছি। এখন কী করব আমি।'

একথা বলেই সে কাঁদতে লাগল।

সাধু বুঝলেন, অসৎ হৃদয়ে সততার উদয় হয়েছে। তিনি শ্রীধরকে বললেন, 'বাবা শ্রীধর, একবার পাপ করলে যে চিরকাল করতে হবে, তা নয়। এসো, পুণ্যের পথে এসো। দেবতার মালা তুমি দেবতাকে ফিরিয়ে দিয়ে এসো। তাহলে তিনিই তোমাকে ক্ষমা করবেন।'

সাধুর কথামতো শ্রীধর বদরিকা আশ্রমে গেল, কাউকে না জানিয়ে দেববিগ্রহের গলার সেই মুক্তার মালাটি পরিয়ে দিল। তারপর বাড়ি না গিয়ে ফিরে গেল সেই সাধুর আশ্রমে।

শ্রীধর সাধুর সঙ্গে থাকে। সাধু প্রতিদিন ভোরে স্নান করেন। শ্রীধরও প্রতিদিন ভোরে উঠে স্নান করা শুরু করল। সে লেগে পড়ল আশ্রমের নানা কাজে।

একদিন নদীতে একটি বিড়ালকে হাবুডুবু খেতে দেখে সে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। তুলে আনল বিড়ালটিকে।

সংক্রামক ব্যাধিতে মৃত এক ভিখারির শব কাঁধে করে শ্মশানে নিয়ে গেল সে।

এভাবে আতের সেবায় ব্রতী হলো শ্রীধর।

একদিন সে সাধুর অনুমতি নিয়ে বাড়ি গেল। তাকে দেখে কেউ চিনতে পারল না। পারবে কী করে? সে তো আর আগের শ্রীধর নেই। সে এখন তরুণ সাধক। তবে তার মা তাকে চিনলেন,

‘শ্রীধর, তুই!’

‘হ্যাঁ মা আমি। আমি তোমার শ্রীধর।’

দুর্বৃত্ত শ্রীধর নয়, চোর শ্রীধর নয়। সে এখন সৎ ও সেবাব্রতী।

সংসজ্ঞা এভাবে দুর্বৃত্তকে সৎ ও সেবাব্রতী এক মহান মানুষে পরিণত করতে পারে।

সংসজ্ঞের এমনই মহিমা।

দলীয় কাজ: শ্রীধরের শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজজীবনে কী প্রভাব ফেলতে পারে এ-বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখ।

নতুন শব্দ : কুষ্ঠা, ধর্মশালা, বিগ্রহ, শব, ব্রতী, দুর্বৃত্ত, সেবাব্রতী।

পাঠ ৬ ও ৭ : সংযম

‘সংযম’ কথাটির অর্থ হলো নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা। শাস্ত্রে হিন্দুধর্মের যে-দশটি লক্ষণের কথা বলা হয়েছে, ‘দম’ ও ‘ইন্দ্রিয়নিগ্রহ’ সেগুলোর অন্তর্গত। ‘দম’ মানে দমন করা। ‘ইন্দ্রিয়নিগ্রহ’ মানে ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করা। ইন্দ্রিয়ের দাবি অনুসারে না চলে তাকে নিজের ইচ্ছেমতো চালানোকেই বলে ‘ইন্দ্রিয়নিগ্রহ’।

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে। ধরা যাক, বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান। একটি ঘরে প্রচুর দই-মিষ্টি এনে রাখা হয়েছে। আমি ঐ ঘরে ঢুকলাম। ঘরে আর কেউ নেই। আমার লোভ হলো, ওখান থেকে একটা মিষ্টি তুলে খাই। কেউ তো আর দেখছে না। পরক্ষণেই চিন্তা হলো, মানুষ না হোক ঈশ্বর তো দেখছেন। তাছাড়া চুরি করা একটা অনৈতিক কাজ। তাই আমি লোভকে দমন করলাম। এর মধ্য দিয়ে আমার জিহবা নামক ইন্দ্রিয়কে নিগ্রহ বা নিয়ন্ত্রণ করা হলো। দম ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহকে একসঙ্গে সংযম বলা হয়।

এ-সংযম তপস্যার অংশ। তপস্যা হচ্ছে লক্ষ্য অর্জনের জন্য সযত্ন প্রচেষ্টা চালানো। যোগশাস্ত্রে বলা হয়েছে, ধর্মের চারটি ভিত্তি। এগুলো হচ্ছে : তপস্যা, শৌচ, দয়া ও সত্য। তপস্যাই মূল ধর্ম। অপর তিনটি তপস্যার অংশ বলে বিবেচিত। তপস্যার আবার প্রকারভেদ আছে। যেমন— শারীরিক তপস্যা, বাচিক তপস্যা, মানসিক তপস্যা ইত্যাদি।

শীত, উষ্ণতা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদি সহ্য করা, দেবতাদের পূজা, গুরুজনদের শ্রদ্ধা করা, সরলতা, অহিংসা প্রভৃতি শারীরিক তপস্যা।

সত্য, প্রিয়, হিতকর বাক্যের প্রয়োগ ও শাস্ত্র পাঠকে বাচিক তপস্যা বলে। আর চিন্তের প্রসন্নতা অনিষ্ঠুরতা বাকসংযম ও আত্মসংযম (নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা), ছলচাতুরী না করা ইত্যাদি হচ্ছে মানসিক তপস্যা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সংযম তপস্যার অংশ এবং ধর্মেরও অঙ্গ।

সংযম ছাড়া জীবন হালহীন নৌকা বা বল্লাহীন ঘোড়ার মতো। কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। তার ফলে জীবনে আসে উচ্ছৃঙ্খলতা। সংযম আমাদের চরিত্রকে শৃঙ্খলামণ্ডিত ও মহৎ করে। সুতরাং সংযমসাধনা সিদ্ধিলাভের অন্যতম প্রধান উপায়।

সংযম ব্রহ্মচর্যের অংশ। সংযমের মধ্য দিয়ে গুরুগৃহে শিক্ষাজীবন অতিবাহিত করার সময়কালকে শাস্ত্রে ব্রহ্মচর্য বলা হয়েছে। সুতরাং সংযম হচ্ছে ছাত্রজীবনের অঙ্গ।

সংযম না থাকলে ব্যক্তিগত ও সামাজিক যে-কোন কাজ পড় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই তো বলা হয়, সংযম হারিয়ে 'রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন'।

সংযমকে সারা জীবনের সঙ্গী করতে হবে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে সংযম বজায় রাখতে হবে। ঋষি বশিষ্ঠ সর্বাবস্থায় সংযম বজায় রেখেছেন বলেই তিনি সর্বজনপূজ্য মহর্ষিরূপে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

পক্ষান্তরে ঋষি দুর্বাসা মাঝেমাঝেই সংযম হারাতে। তার জন্য তিনি কষ্ট ভোগ করেছেন এবং অপযশে কলঙ্কিত হয়েছেন।

সুতরাং সংযম জীবনের সহায়ক। পরমতসহিষ্ণু হতে হলেও সংযমের অভ্যাস করতে হবে।

সংযম ও পরমতসহিষ্ণুতা ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে অপরিহার্য।

একক কাজ : জীবনে সংযমের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

নতুন শব্দ : দম, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, তপস্যা, শৌচ, বাচিক, হিতকর, প্রসন্নতা, বাকসংযম, ছলচাতুরী, হালহীন, বল্লাহীন, সিদ্ধিলাভ।

পাঠ ৮ : অহিংসা

জীবকে পীড়ন ও হত্যা না করাকে বলা হয় অহিংসা। যোগশাস্ত্রে যম (সংযম), নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি নামে যোগের আটটি অঙ্গের কথা বলা হয়েছে। যম বা সংযম অহিংসার ভিত্তি।

সহিংসতা অহিংসার বিপরীত। জীবকে পীড়ন বা হত্যা করার প্রবৃত্তিকে বলে সহিংসতা।

আমরা বিত্ত, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, যশ ইত্যাদি পেতে চাই। আর এগুলো পাওয়ার পথে যারা বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাদের প্রতি সহিংস আচরণ করি। এ-আচরণ অনৈতিক।

সহিংসতা সমাজে বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টি করে এবং মানুষকে কষ্ট দেয়। অনেক সময় সহিংসতা প্রাণহরণের কারণ হয়। সুতরাং সহিংসতা অধর্ম।

মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, যিনি নিষ্ঠুর আচরণ করেন না, কাউকে হিংসা করেন না, তিনি স্বর্গলোক জয় করতে পারেন (৪/২৪৬)। মনুসংহিতা থেকে অহিংসা সম্পর্কে আরও জানতে পারি যে, যিনি অহিংস, তিনি ধর্মকৃত্যসহ সকল সংকাজে সাফল্য লাভ করেন। (৫/৪৫)।

শুধু মনু সংহিতাতেই নয়, হিন্দুধর্মের বিভিন্ন গ্রন্থে অহিংসা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অহিংসা যম (সংযম) নামক যোগের অংশ হিসেবে সাধনা বা তপস্যার সহায়ক, ইহলোকের অবলম্বন এবং পরলোকে মোক্ষলাভের অন্যতম প্রধান উপায়। তাই তো বলা হয় 'অহিংসা পরম ধর্ম'।

মহাভারতে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিতে গিয়ে ভীষ্ম বলেছেন, সকল জীবের অহিংসা পরম ধর্ম বলে জানবে।

হিংসার পরিণাম শুভ হয় না। কৌরবেরা পাণ্ডবদের হিংসা করতেন। তাঁদের পরিণাম শুভ হয়নি।

তবে অহিংসা বলতে কিন্তু কাপুরুষতা বা ভীৰুতাকে বোঝায় না। নির্বিচার ক্ষমাও বোঝায় না। ন্যায়বিচার করে অপরাধীর শাস্তি দান হিংসা বলে গণ্য হবে না।

নিজের স্বার্থে পরপীড়ন, পরের ক্ষতি করার চেষ্টা বা কাউকে হত্যা করাকেই সহিংসতা বলা হয়েছে। সুতরাং পরপীড়ন না করাই অহিংসা। অহিংসা ব্যক্তিকে মহান করে, সমাজে শান্তি আসে। অহিংসা ধর্মের অঙ্গ এবং একটি অনুসরণীয় নৈতিক মূল্যবোধ।

নতুন শব্দ : যোগশাস্ত্র , প্রবৃত্তি, ইহলোক, পরলোক, মোক্ষলাভ, কৌরব, পাণ্ডব।

পাঠ ৯ : পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ন্যায়বিচার, সৎসজ্জা, সংযম ও অহিংসা— এ-মূল্যবোধগুলো গঠনের উপায়।

ন্যায়বিচার

বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদের আদর্শ অনুসরণ করে আমরা পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ন্যায়বিচার নামক মূল্যবোধ গঠন করতে পারি। মহাভারতে আছে, অযোধ্যার রাজা সত্যকামের পিতা রাজা দ্যুমত্সেন মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য কয়েকজন অপরাধীকে সত্যকামের কাছে পাঠিয়েছিলেন। সত্যকাম তখন বলেছিলেন, অপরাধীর কার্য নীতিশাস্ত্র অনুসারে বিচার না করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া অন্যায়। সত্যকামের কথার মধ্যে ন্যায়বিচারের আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে। সুতরাং ধর্মগ্রন্থ থেকে আমরা যদি ন্যায়বিচারের আদর্শ গ্রহণ করি, তাহলে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ন্যায়বিচারের মূল্যবোধ গঠিত হবে।

সৎসজ্জা

সৎসজ্জার আদর্শও আমরা ধর্মগ্রন্থ থেকে পাই। অসৎসজ্জা পরিত্যাগ করে আমরা যদি সৎসজ্জা করি, তাহলে সৎসজ্জার মূল্যবোধ গঠিত হবে। সৎসজ্জা কেবল পুঁথিগত বিদ্যার বিষয় নয়, তা আচরণীয় বিষয়। জীবনে প্রয়োগ করার বিষয়।

সংযম

সংযম অষ্টাঙ্গ যোগের অন্যতম। পরিবার ও সমাজের সকল সদস্য যদি প্রতিনিয়ত সংযত আচরণ করে, তাহলে পরিবার ও সমাজজীবনে সংযম নামক মূল্যবোধটি গঠিত হবে। আর এ সংযত মানুষদের আচরণ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আচরণেও প্রতিফলিত হবে। সুতরাং সংযত আচরণের অনুশীলনই সংযম নামক মূল্যবোধটি গঠনের উপায়।

অহিংসা

অহিংসা যম বা সংযম নামক অষ্টাঙ্গ যোগের অঙ্গ। অহিংসা ছাড়া ধর্মাচরণ সম্ভব নয়। অহিংসাও অনুশীলনসাধ্য। কোনো অবস্থাতেই আমরা জীবকে হিংসা করব না। জীবকে ব্রহ্ম জ্ঞান করব। তাহলে আর মনে হিংসার জন্ম হবে না। শ্রীমদভগবদ্গীতার উপদেশ অনুসরণ করে ক্রোধ ও ঈর্ষাকে দূরে রাখব। মনের মধ্যে সর্বদা থাকবে সন্তোষ। সুখ ও দুঃখকে সমানভাবে গ্রহণ করব। প্রাপ্তিতে অহংকারী হব না, অপ্ৰাপ্তিতেও ভেঙে পড়ব না। এভাবে জীবনযাপন করলে অহিংস হবই।

মোটকথা, উপলব্ধি ও অনুশীলনই যে-কোনো প্রকার মূল্যবোধ গঠনের প্রকৃষ্ট উপায়। একথা মনে রেখে বাস্তব জীবনে তার প্রতিফলন ঘটাতে সচেষ্ট থাকব।

নতুন শব্দ : অর্ঘ্যাজ্ঞা, অনুশীলনসাধ্য, দীর্ঘা, অপ্রাপ্তি।

পাঠ ১০ : এইচআইভি/এইডস ও তার প্রতিকার

এইডস ও এইচআইভির ধারণা

নৈতিকতার বিপরীত প্রবৃত্তি হচ্ছে অনৈতিকতা। মানুষ যেমন ভালো কাজ করে, তেমনি মন্দ কাজেও লিপ্ত হয়। সাদার বিপরীতে যেমন কালো থাকে, তেমনি আলোর বিপরীতে থাকে অন্ধকার। আমাদের নৈতিক মূল্যবোধের পাশাপাশি অনৈতিক কাজ সম্পর্কেও ধারণা অর্জন করতে হয়। অনৈতিক কাজকে চিনে রাখলে আমরা তা থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক থাকতে পারব। আমরা ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে ধূমপান ও মাদকাসক্তির মতো অনৈতিক কাজ সম্পর্কে জেনেছি।

এ-শ্রেণিতে আমরা এখন এমন একটি রোগ সম্পর্কে জানব, যার উৎস একটি অনৈতিক কাজ। রোগটির নাম এইডস।

এইডস একটি মারাত্মক রোগ। এইডস-এ আক্রান্ত হলে রোগীর রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে কমে যায়। তার ফলে সে নানাপ্রকার রোগে ঘনঘন আক্রান্ত হতে থাকে। এ-রোগ এখন পর্যন্ত নিরাময়যোগ্য নয়। শেষ পর্যন্ত রোগীর অকালমৃত্যু ঘটে।

এইডস কথাটি ইংরেজি AIDS-এর পূর্ণরূপ হলো :

A = Acquired

I = Immune

D = Deficiency

S = Syndrome

Acquired Immune Deficiency Syndrome সংক্ষেপে AIDS (এইডস)।

এইডস রোগ হয় একপ্রকার অতি ক্ষুদ্রাকৃতির জীবাণু থেকে। যাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা বলেন একপ্রকার ভাইরাস। এ ভাইরাসটির নাম হচ্ছে এইচআইভি। এইচআইভি ইংরেজি HIV-এর পূর্ণরূপ : Human Immune Deficiency Virus.

এইডস-এর কারণ

ক. শরীরে এইচআইভি ভাইরাস আছে, এমন কারও রক্ত যদি অন্যের শরীরে সঞ্চালন করা হয়, তাহলে রক্ত গ্রহণকারী ব্যক্তির এইডসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। একজনের ব্যবহৃত সিরিঞ্জ বা সুই যদি অন্যজন ব্যবহার করে তাহলে এইচআইভি ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে। যারা ইনজেকশনের মাধ্যমে নেশা করে, তারা এভাবে এইডস-এ আক্রান্ত হতে পারে। যেহেতু রক্তের মধ্য দিয়ে এইচআইভি সংক্রামিত হয়, সুতরাং ব্যবহৃত ব্লেড, ক্ষুর, চাকু ইত্যাদির মাধ্যমেও এ-জীবাণু ছড়াতে পারে।

- খ. এইডস-এর অন্যতম কারণ হচ্ছে যৌনমিলন। কেউ যদি এইচআইভি ভাইরাস বহন করছে, এমন কারও সঙ্গে যৌনভাবে মিলিত হয়, তাহলে তার এইডস-এ আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- গ. গর্ভকালীন সময়ে বা গর্ভাবস্থায়, প্রসবকালে এবং জন্মের পরে বুকের দুধের মাধ্যমে শিশুর শরীরে এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে।

তবে এইডস ছোঁয়াচে রোগ নয়। এইসড-এ আক্রান্ত রোগীর সঙ্গে দৈনন্দিন সাধারণ কাজকর্ম করলে এইডস হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

এইডস-এ আক্রান্ত রোগীর সঙ্গে কোলাকুলি করলে, একই টয়লেট ব্যবহার করলে, তার কফ বা সর্দি থেকে কিংবা তার চোখের জল বা ঘাম থেকে এইচআইভি সংক্রমণের কোনো সম্ভাবনা নেই।

এইচআইভি সংক্রমণ হয় রক্ত, যৌনমিলন এবং আক্রান্ত মায়ের বুকের দুধের মাধ্যমে।

এইচআইভি/এইডস-এর প্রভাব

১. স্বাস্থ্যসেবার ওপর প্রভাব

- ক. এইচআইভি/এইডস জনস্বাস্থ্যগত মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করে।
- খ. স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দের একটা বড় অংশ আক্রান্তদের পেছনে ব্যয় করতে হয়।
- গ. একজন এইচআইভি পজিটিভ বহনকারীর দ্বারা বাহিত হয়ে এইডস রোগ অন্যদের সংক্রমিত করতে পারে।

২. অর্থনৈতিক প্রভাব

- ক. উৎপাদন খাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
- খ. পর্যটন খাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৩. সামাজিক প্রভাব

- ক. অনাথ বা এতিম ও বিধবাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।
- খ. সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন শিথিল হয়।
- গ. এইডস-এ আক্রান্ত ব্যক্তিকে সমাজের অধিকাংশ লোক ঘৃণার চোখে দেখে। আক্রান্ত ব্যক্তিও লজ্জায় মরমে মরে থাকে।
- ঘ. জীবনে বঞ্চনা, হতাশা, অবিশ্বাস, ভয় ও অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পায়।

এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধের উপায়

যেসব কারণে এইচআইভি সংক্রমিত হয়ে এইডস রোগের সৃষ্টি করে, সেগুলো পরিহার করতে হবে, যেমন—

১. রক্ত পরীক্ষা করার সময় দেখতে হবে, রক্তদাতা এইচআইভি বহন করছে কি না। এইচআইভি-আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ করা যাবে না।

২. ধর্মীয় অনুশাসন মেনে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই যৌনমিলনে লিপ্ত হওয়া যাবে না।

৩. বিবাহিত জীবনে স্বামী/স্ত্রীর মধ্যেই যৌনমিলন ঘটবে। অবৈধ যৌনমিলন থেকে চিরতরে বিরত থাকতে হবে।

হিন্দুধর্মে ছাত্রজীবনে কঠোর ব্রহ্মচর্য পালনের বিধান রয়েছে। মনুসংহিতায় পরদারগমন নামক পাপকে পঞ্চমহাপাপের অন্যতম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এ-ধর্মে মাদকাসক্তিকে কেবল বর্জন করতেই বলেনি, মাদকাসক্তের সংসর্গে যাওয়া বা থাকাকেও মহাপাপ বলে গণ্য করা হয়েছে।

সুতরাং হিন্দুধর্মের বিধিবিধান তথা অনুশাসন যথাযথভাবে মেনে চললে শুধু এইডসই না, যে-কোনো রকম যৌনরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

আমাদের দেহ তো আত্মারূপে বিরাজমান ঈশ্বরের মন্দির। আমরা বাইরের মন্দির পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখি। তাহলে দেহমন্দিরকে পবিত্র রাখব না কেন? আর দেহমন্দিরকে পবিত্র রাখলেই এইচআইভি/এইডস থেকে মুক্ত থাকতে পারব।

এইচআইভি/এইডস-এ আক্রান্ত রোগীর প্রতি আচরণ

হিন্দুধর্ম বলে, ‘পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়।’ তাই আমরা এইডস রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে মমতাময় আচরণ করব। একজন স্বাভাবিক মানুষ থেকে তাঁকে আলাদা করে দেখব না। তাঁর মানবিক মর্যাদাকে খাটো করে দেখব না। কারণ আমরা জানি, এইডস সংক্রামক রোগ নয়। তাই এইডস-এ আক্রান্ত ব্যক্তিকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই।

আমরা এমন ভাবে একজন এইচআইভি/এইডস-এ আক্রান্ত রোগীর সঙ্গে ব্যবহার করব, যাতে তাঁর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত না হয়। তিনি যেন স্বাভাবিকভাবে সকল কাজ করতে পারেন। তাঁর মন যেন প্রফুল্ল থাকে। হিন্দুধর্ম জীবকে ব্রহ্মজ্ঞানে সেবা করতে বলেছে। এইডস রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিও যেন সে-সেবা থেকে বঞ্চিত না হয়।

দলীয় কাজ : এইডস রোগীদের প্রতি করণীয় দিকগুলো লিখে পোস্টার তৈরি কর।

নতুন শব্দ : নিরাময়যোগ্য, সিরিঞ্জ, ব্লড, স্কুর, যৌনমিলন, গর্ভকালীন, প্রসবকালে, ছোঁয়াচে, পরদারগমন, পঞ্চমহাপাপ, দেহমন্দির।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. আমাদের সর্বদা কথা বলা উচিত।
২. মূল্য কথাটি দ্বারা মান বা বোঝায়।
৩. নৈতিক মূল্যবোধ অঙ্গ।
৪. প্রহ্লাদ জন্মগ্রহণ করেছিলেন।
৫. সৎসজ্জা হচ্ছে সান্নিধ্য।

| বাম পাশ | ডান পাশ |
|-----------------------|--------------------------|
| ১. পরশপাথর | ঈশ্বরকে সেবা করা হয় |
| ২. জীবসেবা করলে | স্নান করেন |
| ৩. সাধু প্রতিদিন ভোরে | মহৎ গুণ |
| ৪. পরমতসহিষ্ণুতা | হিংসার বিপরীত দিক |
| | লোহাকে স্বর্ণে পরিণত করে |

১. সংসজ্জা বলতে কী বোঝায় ?
২. অহিংসাকে পরম ধর্ম বলার কারণ বুঝিয়ে লেখ
৩. মানবজীবনে সংখ্যমের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে লেখ।
৪. নৈতিক মূল্যবোধের ধারণা ব্যাখ্যা কর।

১. বর্তমান সমাজে ন্যায়বিচারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।
২. 'সৎসঙ্গের মাধ্যমে জীবনের চরম শিখরে আরোহণ করা সম্ভব'- শ্রীধরের জীবনাবলুনে ব্যাখ্যা কর।
৩. 'এইডস' প্রতিরোধের জন্য চাই সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা- মন্তব্যটি ব্যাখ্যা কর।

১. যোগশাস্ত্রে যোগের কয়টি অঙ্গের কথা বলা হয়েছে ?

| | |
|----------|----------|
| ক. চারটি | খ. ছয়টি |
| গ. আটটি | ঘ. দশটি |

২. 'এইডস' প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন -

- ধর্মীয় অনুশাসন
- ব্যক্তিসচেতনতা
- সহনশীলতা

କ. i ଥ. i ଓ ii
ଗ. ii ଓ iii ଘ. i, ii ଓ iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

রবিন দেখল কয়েকটি ছেলে কৌতূহলবশত একটি বিড়ালকে আঘাত করছে। বিড়ালটির খুবই খারাপ অবস্থা। সে ছেলেগুলোকে তাড়িয়ে দিল এবং বিড়ালটিকে বাড়িতে নিয়ে সেবা করতে লাগল।

৩. রবিনের মধ্যে কাজ করেছে—

- i. অহিংসা
- ii. ন্যায়-বিচার
- iii. সংসজ্জা

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৪. উক্ত কাজের মাধ্যমে রবিনের পক্ষে সম্ভব—

- i. পুণ্যার্জন
- ii. ভালোবাসা লাভ
- iii. স্বর্গলাভ

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন :

দিনেশবাবু এলাকায় ধনী ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত। তাঁর দুই ছেলে। বড় ছেলে ঢাকায় একটি বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করে, আর ছোট ছেলে বাড়িতেই তাঁর সাথে সংসারের কাজকর্ম তদারকি করে। বড় ছেলে অফিসের কাজের ঝামেলায় সহজে বাড়ি যেতে পারে না, আর সেটাই দিনেশবাবুর ক্ষোভ। তিনি একবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন, এই সময় তিনি তাঁর সম্পদের চার ভাগের তিন ভাগ ছোট ছেলের নামে লিখে দেন।

- ক. পুত্রদের পুত্রের নাম কী ?
- খ. সংসজ্জাকে অত্যন্ত মধুর বলার কারণ ব্যাখ্যা কর।
- গ. দিনেশবাবুর আচরণের সাথে নৈতিক মূল্যবোধের কোন দিকটির বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায় ? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. দিনেশবাবুর কাজটি তোমার পঠিত ‘পুত্রদের ন্যায়বিচার’ উপাখ্যানের আলোকে মূল্যায়ন কর।

২০১৩
শিক্ষাবর্ষ
৮-হিন্দুধর্ম

মন যার সংশয়ী তার বড় কষ্ট
-শ্রী সারদা দেবী

দেশকে ভালোবাসো, দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ কর
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা



২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :